وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾
مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوا فِيهَا
هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا
يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ
الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا
إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ
مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾

(৯১) এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। (৯২) তাদেরকে বলা হবে ঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে (৯৩) আল্লাহ্র পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? (৯৪) অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে (৯৫) এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। (৯৬) তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে ঃ (৯৭) আল্লাহ্র কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, (৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম। (৯৯) আমাদেরকে দুষ্টকর্মীরাই গোমরাহ্ করেছিল। (১০০) অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (১০১) এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। (১০২) হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম! (১০৩) নিশ্চয়, এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১০৪) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১০৫) নূহের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (১০৬) যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বললেন, "তোমাদের কি ভয় নেই? (১০৭) আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত বার্তাবাহক। (১০৮) অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১০৯) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১১০) অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" (১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা? (১১২) "নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? (১১৩) তাদের হিসাব নেয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে। (১১৪) আমি মুমিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। (১১৫) আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।" (১১৬) তারা বলল, "হে নূহ, যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।" (১১৭) নূহ বললেন, "হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে ঃ আলোচ্য আয়াতের বহুল প্রচলিত তফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কেয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে, যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোন সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মুমিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এ ব্যয়কৃত অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাশরের ময়দানে ও হিসাবের দাঁড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ্ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোন সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করবে অথবা সওয়াব পৌঁছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎ কর্মের সওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্যে সুপারিশ করবে। যেমন, কোন কোন হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে ; বিশেষতঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সৎকর্ম পিতা-মাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌঁছে, তবে পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা বাপ-দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপ-দাদার উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়ে দেবেন। কোরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে — أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ, আমি আমার সৎবন্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লেখিত প্রসিদ্ধ তফসীর থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসে যেখানেই কেয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমন কি, পয়গম্বরের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মুমিন না হয়, তবে তাঁর পয়গম্বরী দ্বারা কেয়ামতের দিন তাদের কোন উপকার হবে না যেমন, হযরত লূত (আঃ)-এর পুত্র, নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার ব্যাপার তাই। কোরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তাই হতে পারে —

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ — فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ

এবং لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ

সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান ঃ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষীগণ একে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীগণ অপারক অবস্থায় একে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا আয়াতের অধীনে এসে গেছে।

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾
فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ
الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَ
إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ
قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَ
تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ
جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا
تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ
أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا
نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَ
مَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾
كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

(১১৮) অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সংগী মুমিনগণকে রক্ষা করুন।'' (১১৯) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গিগণকে বোঝাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম। (১২০) এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। (১২১) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১২২) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১২৩) আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১২৪) তখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন ঃ 'তোমাদের কি ভয় নেই? (১২৫) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। (১২৬) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ? (১২৯) এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? (১৩০) যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। (১৩১) অতএব, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান, (১৩৪) এবং উদ্যান ও ঝরণা। (১৩৫) আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।'' (১৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। (১৩৭) এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ নয়। (১৩৮) আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতএব, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৪০) এবং আপনার পালনকর্তা, তিনি তো প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৪১) সামূদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ, তাদেরকে বললেন, '' তোমরা কি ভয় কর না?

জ্ঞাতব্য ঃ এ স্থলে فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ আয়াতটি তাকীদের জন্যে এবং একথা ব্যক্ত করার জন্যে আনা হয়েছে যে, রসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্যে কেবল রসূলের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে রসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহ্‌কে ভয় করা তো আরও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি কর্ম ও চরিত্র-পরিবার ও জাঁকজমক নয় ঃ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ — এ আয়াতে প্রথমতঃ মুশরেকদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচ লোক। আমরা সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরূপে একাত্ম হতে পারি? নূহ (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। নূহ (আঃ) জওয়াবে বললেন, আমি তাদের কাজকর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক ভদ্রতা অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমককে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর, এটা ভুল; বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতরজন বলে দেয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্রজন, আমরা তার ফয়সালা করতে পারি না। — (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা ঃ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন যে, رِيعٍ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত মুজাহিদ থেকে ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, رِيعٍ উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই ريع النبات উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ, বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। آيَةً এর আসল অর্থ নিদর্শন। এস্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বোঝানো হয়েছে। تَعْبَثُونَ শব্দটি عبث থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অযথা, যাতে কোন প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। مَصَانِعَ শব্দটি — مصنع - এর বহুবচন। হযরত কাতাদা বলেন, مَصَانِعَ বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে; কিন্তু হযরত মুজাহিদ বলেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে। لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ইমাম বোখারী সহীহ্ বোখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে لعل শব্দটি تشبيه অর্থাৎ, রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস এর অনুবাদে বলেন كانكم تخلدون —অর্থাৎ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে।- (রূহুল মাআনী)

বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরীয়ত মতে দূষণীয়। হযরত আনাসের জবানী ইমাম তিরমিযী বর্ণিত এই হাদীসের অর্থও তাই— অর্থাৎ, প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا
آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾
وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ
لَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ
لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ
عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ
الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَ
تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

(১৪৩) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৪৪) অতএব, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪৫) আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৪৬) তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে? (১৪৭) উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরণাসমূহের মধ্যে? (১৪৮) শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? (১৪৯) তোমরা পাহাড় কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ। (১৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৫১) এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না; (১৫২) যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।' (১৫৩) "তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের একজন। (১৫৪) তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর।" (১৫৫) সালেহ্ বললেন, 'এই উষ্ট্রী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা— নির্দিষ্ট এক-এক দিনের। (১৫৬) তোমরা একে কোন কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে। (১৫৭) তারা তাকে বধ করল। ফলে, তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। (১৫৮) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৫৯) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৬০) লূতের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৬১) যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না? (১৬২) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৬৩) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৬৪) আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন। (১৬৫) সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? (১৬৬) এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।"

মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। হযরত আনাসের অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় — অর্থাৎ, প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্যে বিপদ, কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরী তা বিপদ নয়। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে; বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরীয়তেও নিন্দনীয় ও দূষণীয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে فَارِهِينَ এর তফসীরে বলা হয়েছে অহংকারী। আবু সালেহ ও ইমাম রাগেবের মতে فَارِهِينَ এর তফসীর حاذقين অর্থাৎ, নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহ্‌র নেয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয় ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত এবং তদ্দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েয। কিন্তু তা দ্বারা যদি গোনাহ্, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন না-জায়েয; যেমন পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম ঃ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ আয়াতের من অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছ। এটা হীনমন্যতার পরিচায়ক। من অব্যয়টি এখানে تبعيض এর জন্যেও হতে পারে। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের যে স্থান তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সেই স্থান ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বাভাবিক কাজ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম। এই দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। نعوذ بالله منه (রূহুল মাআনী)

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي
لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَ
أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾
كَذَّبَ أَصْحَابُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا
تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾
قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَ
إِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ
إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

(১৬৭) তারা বলল, "হে লূত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কৃত করা হবে।" (১৬৮) লূত বললেন, "আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।" (১৭০) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম। (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (১৭২) এরপর অন্যদেরকে নিপাত করলাম। (১৭৩) তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ভীতি-প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। (১৭৪) নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৭৫) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৭৬) বনের অধিবাসীরা পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৭৭) যখন শো'আয়ব তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না? (১৭৮) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৭৯) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৮১) মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (১৮২) সোজা দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর। (১৮৩) মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। (১৮৪) ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। (১৮৫) তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্যতম। (১৮৬) তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। আমাদের ধারণা-তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৮৭) অতএব, যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও। (১৮৮) শো'আয়ব বললেন, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমার পালনকর্তা ভালরূপে অবহিত। (১৮৯) অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে দিল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ এখানে عَجُوزً বলে লূত (আঃ)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে কওমে লূতের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফের ছিল।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া জায়েয। হানাফী আলেমদের মাযহাব তাই। কেননা, লূত সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টা করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। — (শামী ঃ কিতাবুল হুদূদ)

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ কারো কারো মতে قسط গ্রীক শব্দ, যার অর্থ ন্যায় ও সুবিচার। কেউ কেউ একে আরবী শব্দ قسط থেকে উদ্ভূত বলেছেন।

এর অর্থও সুবিচার। উদ্দেশ্য এই যে, দাঁড়িপাল্লা এবং এমনি ধরনের মাপ ও ওজনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে কম হওয়ার আশংকা না থাকে।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ অর্থাৎ, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না। উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চাইতে কম দেয়া হারাম; তা কোন মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু। এ থেকে জানা গেল যে, কোন শ্রমিক-কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাযে শরীক না হতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছু অজুহাত পেশ করল। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, طففت অর্থাৎ, তুমি ওজনে কম করেছ। যেহেতু নামায ওজনের বস্তু নয়, তাই এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালেক বলেন, وفاء وتطفيف অর্থাৎ, প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে পারে। শুধু মাপ ও ওজনের সাথেই এই বিধান সংশ্লিষ্ট নয়; বরং কারো হক কম দেয়া, তা যেভাবেই হোক না কেন — হারাম। وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে।

فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নীচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নীচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। — (রূহুল মা'আনী)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ
الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ
عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن
يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ
الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُم
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ
جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾
وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا
ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ
اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

(১৯০) নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। (১৯১) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৯২) এই কোরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। (১৯৩) বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, (১৯৫) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। (১৯৭) তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে? (১৯৮) যদি আমি একে কোন ভিন্নভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম, (১৯৯) অতঃপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন, তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। (২০০) এমনিভাবে আমি গোনাহ্গারদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (২০১) তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ না করে মর্মন্তুদ আযাব; (২০২) অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে, তারা তা বুঝতেও পারবে না। (২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পাব না? (২০৪) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে? (২০৫) আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, (২০৬) অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হত, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, (২০৭) তখন তাদের ভোগ-বিলাস তা তাদের কি উপকারে আসবে? (২০৮) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তার সতর্ককারী ছিল। (২০৯) স্মরণ করানোর জন্যে, এবং আমার কাজ অন্যায়াচরণ নয়। (২১০) এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি। (২১১) তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১২) তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা রয়েছে। (২১৩) অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন। (২১৪) আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। (২১৫) এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ ও অর্থসম্ভারের সমষ্টির নাম কোরআন ঃ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবী ভাষায় লিখিত কোরআনই কোরআন। অন্য যে কোন ভাষায় কোরআনের কোন বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কোরআন বলা হবে না।

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ থেকে বাহ্যতঃ এর বিপরীতে একথা জানা যায় যে, কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় থাকলে তাও কোরআন। কেননা, إِنَّهُ এর সর্বনামটি বাহ্যতঃ কোরআনকে বোঝায়। زُبُر زبور শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলাবাহুল্য, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাব আরবী ভাষায় ছিল না। কেবল কোরআনের অর্থসম্ভার সেসব কিতাবে উল্লেখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এই যে, কোন সময় শুধু কোরআনের বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক অর্থে কোরআন বলে দেয়া হয়। কারণ, কোন কিতাবের বিষয়বস্তুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কোরআন উল্লেখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কোরআনের কোন কোন বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। অনেক হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আমাকে সূরা বাক্বারা 'প্রথম আলোচনা' থেকে দেয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা طٰسٓ দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা حٰمٓ দ্বারা শুরু হয়, সেগুলো মূসা (আঃ)-এর ফলক থেকে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সূরা ফাতেহা আরশের নীচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকেম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মুল্‌ক তওরাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা সাব্বিহিস্‌মা সম্পর্কে তো স্বয়ং কোরআন বলে যে,

إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ অর্থাৎ, এই সূরার বিষয়বস্তু হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)- এর সহীফাসমূহেও আছে। সব আয়াত ও রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, কোরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরী নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কোরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কোরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্ভারের নামও নয়। যদি কেউ কোরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরূপ বাক্য গঠন করে, الحمد لله العزيز الرحيم الذى له ملك السماوات وهو رب العالمين خالق كل شئ وهو المستعان তবে একে কেউ কোরআন বলতে পারবে না।

এমনিভাবে শুধু কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কোরআন বলা যায় না।

নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতক্রমে অবৈধ ঃ এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাযে ফরয তেলাওয়াতের স্থলে কোরআনের শব্দাবলীর অনুবাদ ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ইত্যাদি কোন ভাষায় পাঠ করা অপারক অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয়। কোন

কোন ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কোরআনের বাংলা অনুবাদকে বাংলা কোরআন' বলা জায়েয নয় ঃ এমনিভাবে আরবীর মূল বাক্যাবলী ছাড়া শুধু কোরআনের অনুবাদ কোন ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কোরআন বলা জায়েয নয়; যেমন আজকাল অনেকেই শুধু বাংলা অনুবাদকে 'বাংলা কোরআন' ইংরেজী অনুবাদকে 'ইংরেজী কোরআন' বলে থাকে। এটা না–জায়েয ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলী ছাড়া কোরআনকে অন্য কোন ভাষার 'কোরআন' নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়–বিক্রয় করা না–জায়েয।

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ্ তাআলার একটি নেয়ামত। কিন্তু যারা এই নেয়ামতের নাশোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘ জীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোন কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয প্রতিদিন সকালে তাঁর শ্মশ্রু ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ এরপর অঝোরে কাঁদতে থাকতেন।

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ – عشيرة শব্দের অর্থ পরিবারবর্গ। اقربين বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বোঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, সমগ্র উম্মতের কাছে রেসালত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর ফরয ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোন মিথ্যা দাবীদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিদিত, তার সত্য দাওয়াত কবূল করা তাদের জন্যে সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোন আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহমর্মিতা এবং সাহায্যও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয়–স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরী হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলী পালন করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরী হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا অর্থাৎ, নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ–সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে নিজে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণরূপে নামায পালন করতে চায়, তবে পাকা নামাযীর পক্ষেও যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এই নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ করা কঠিন কাজ; বরং কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জাতি–গোষ্ঠী যে ক্ষেত্রে গোনাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আস্তে আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ঈমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পিতৃব্য হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে।

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ
الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾
وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ
يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا
ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

طس ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَىٰ
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ
هُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾

(২১৬) যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত। (২১৭) আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর, (২১৮) যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে দণ্ডায়মান হন, (২১৯) এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন। (২২০) নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (২২১) আমি আপনাকে বলব কি কার নিকট শয়তানরা অবতরণ করে? (২২২) তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহ্‌গারের উপর। (২২৩) তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২৪) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। (২২৫) তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে? (২২৬) এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না। (২২৭) তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্‌কে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ?

সূরা-নমল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৯৩

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) ত্বা-সীন; এগুলো আল-কোরআনের আয়াত এবং আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের। (২) মু'মিনদের জন্যে পথনির্দেশ ও সুসংবাদ। (৩) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে। (৪) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব, তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (৫) তাদের জন্যেই রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিকক্ষতিগ্রস্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কবিতার সংজ্ঞা : وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ অভিধানে এমন বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর জন্যে ছন্দ, ওজন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রেও এ ধরনের বিষয়বস্তুকে 'কবিতাধর্মী প্রমাণ' এবং কবিতা-দাবীযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গজলেও সাধারণতঃ কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোন কোন তফসীরকারক কোরআনের شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ — لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ইত্যাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যাবলী নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফেরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ, তারা কবিতার রীতি-নীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলাবাহুল্য, কোরআন কবিতাবলীর সমষ্টি নয়।

একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না। প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা দূরের কথা; বরং কাফেররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ, কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী বলা। কারণ, شعر (কবিতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং كَذُوبٌ তথা মিথ্যাবাদীকে شَاعِرٌ বলা হয়। তাই প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যাবলীকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যারা ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলী রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল-বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাযিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবেত, কা'ব ইবনে মালেক প্রমুখ সাহাবী কবি ক্রন্দনরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, আয়াতের শেষাংশে পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা যেন অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরেক কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত। —(ফতহুল-বারী)।

ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান : উল্লেখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বোঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ্

তাআলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গোনাহ্ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র সেগুলোকে আল্লাহ্ তাআলা إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন। কোন কোন কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে এবাদত ও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে আছে, ان من الشعر لحكمة অর্থাৎ, কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে।—(বোখারী) হাফেয ইবনে হাজার বলেন, এই রেওয়ায়েতে 'হেকমত' বলে সত্যভাষণ বোঝানো হয়েছে। ইবনে বাত্তাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব, তাঁর যিকর এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরোক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরও সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়। (১) ওমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবু সলতের একশ' লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। (২) মুতারিক বলেন, আমি কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনযিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। (৩) তাবারী প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন, শুনতেন এবং শোনাতেন। (৪) ইমাম বোখারী বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) কবিতা বলতেন। (৫) আবু ইয়ালা ইবনে ওমর থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও গোনাহের হলে কবিতা মন্দ।—(ফতহুল বারী)

তফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার দশ জন জ্ঞানে-গরিমায় সেরা ফেকাহ্বিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাযী যুবায়র ইবনে বাক্কারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। কুরতুবী আবু আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারেন না। কেননা, ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবিগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেননি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র স্মরণ, এবাদত ও কোরআন থেকে গাফেল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বোখারী একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবু হোরায়রার এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন ঃ

لان يمتلئ جوف رجل قيحا يراه خير من ان يمتلئ شعرا

অর্থাৎ, পুঁজ দ্বারা পেট ভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চাইতে উত্তম। ইমাম বোখারী বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহ্র স্মরণ, কোরআন ও জ্ঞানচর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভর্ৎসনা, বিদ্রূপ অথবা অন্য কোন শরীয়ত-বিরোধী বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও না-জায়েয। এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাওহারাম।—(কুরতুবী)

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহ্ওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়! — (কুরতুবী)

যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ্ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফেল করে দেয়, তা নিন্দনীয় ঃ ইবনে আবী জমরাহ বলেন, যে জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

সূরা অন-নমল,

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে বলেন যে, এখানে أَعْمَالَهُمْ বলে তাদের সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সৎকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু জালেমরা এদিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি; বরং কুফর ও শেরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ, প্রথমতঃ সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন —

زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ —— زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ সৎকর্মের জন্য এই শব্দের ব্যবহার খুবই কম; যেমন حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ দ্বিতীয়তঃ আয়াতে উল্লেখিত أَعْمَالَهُمْ (তাদের কর্ম) শব্দ একথা বোঝায় যে, এর অর্থ কুকর্ম-সৎকর্ম নয়।

وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ٦ إذ قال موسى
لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس
لعلكم تصطلون ٧ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار و
من حولها وسبحان الله رب العلمين ٨ يموسى إنه أنا الله
العزيز الحكيم ٩ وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان
ولى مدبرا ولم يعقب يموسى لا تخف إني لا يخاف لدي
المرسلون ١٠ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني
غفور رحيم ١١ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من
غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا
قوما فسقين ١٢ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا
سحر مبين ١٣ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ١٤ ولقد آتينا داود و
سليمن علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده
المؤمنين ١٥ وورث سليمن داود وقال يأيها الناس علمنا
منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ١٦

(৬) এবং আপনাকে কোরআন প্রদত্ত হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহ্র কাছ থেকে। (৭) যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন ঃ 'আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোন খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্যে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৮) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন, তখন আওয়াজ হল, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে আছেন এবং যারা আগুনের আশেপাশে আছেন। বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত। (৯) হে মূসা, আমি আল্লাহ্, প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি।' অতঃপর যখন তিনি তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। হে মূসা, ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্বরগণ ভয় করেন না। (১১) তবে যে বাড়াবাড়ি করে এরপর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে। নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২) আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন, সুশুভ্র হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায়।' এগুলো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (১৩) অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু। (১৪) তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? (১৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, 'আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' (১৬) সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হে লোকসকল, আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।'

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إذ قال موسى لأهله **মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়ঃ** মূসা (আঃ) এস্থলে দু'টি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। (এক), বিস্মৃত পথ জিজ্ঞাসা। (দুই), অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা, রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তুর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাথে সাথে এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবী করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ্ তাআলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বোঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবতঃ এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত — পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা।—(রূহুল-মা'আনী)।

এস্থলে হযরত মূসা (আঃ) تصطلون ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ, শোআয়ব (আঃ)-এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্যে সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর পত্নীদের জন্যে বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করা বরং ইশারা-ইঙ্গিতে বলা উত্তম ঃ আয়াতে قال موسى لأهله বলা হয়েছে। **أهل** শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও শামিল থাকে। এস্থলে মূসা (আঃ)- এর সাথে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন, অন্য কেউ ছিল না, কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন সাধারণভাবে একথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক একথা বলে।

فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحن
الله رب العلمين يموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم

মূসা (আঃ)-এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপ ঃ মূসা (আঃ)-এর এই ঘটনা কোরআন পাকের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দু'টি বাক্য চিন্তা-সাপেক্ষ – প্রথম بورك من في النار এবং দ্বিতীয় إنه أنا الله العزيز الحكيم সূরা তোয়াহায় এই ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে— إذ رأى نارا থেকে

نودي يموسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس
طوى - وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا
أنا فاعبدني

এসব আয়াতেও দু'টি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তাসাপেক্ষ। প্রথম إِنِّيٓ أَنَا رَبُّكَ এবং দ্বিতীয় إِنَّنِيٓ أَنَا اللّٰهُ – সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

এই সূরাত্রয়ের বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্নরূপ হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সে রাত্রিতে একাধিক কারণে হযরত মূসা (আঃ)- এর অগ্নি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তুর পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাঁকে অগ্নি দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ থেকে এ আওয়াজ শোনা গেল- إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - إِنِّيٓ أَنَا رَبُّكَ - إِنِّيٓ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ - إِنَّنِيٓ أَنَا اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا –এটা সম্ভবপর যে, এই আওয়াজ বার বার হয়েছে — একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তফসীরে বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়্যান এবং রূহুল-মা'আনীতে আল্লামা আলুসী এই আওয়াজ শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে; এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে একইরূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোন বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে — শুধু কর্ণ নয়, বরং হাত, পা ও অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল একটা মু'জেযাবিশেষ।

এটা গায়বী আওয়াজ, নির্দিষ্ট কোন দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রুত হচ্ছিলো, কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ, যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে মানুষের জন্যে বিভ্রান্তি ও তা প্রতিমাপূজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনার সাথে সাথে তওহীদের বিষয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে وَسُبْحَانَ اللَّهِ শব্দ এই হুঁশিয়ারীর জন্যেই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহায় لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا এবং সূরা কাসাসে أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ এই বিষয়বস্তুকেই জোরদার করার জন্যে আনা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আঃ) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল। নতুবা আগুনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহ্র কালাম ও আল্লাহ্র সত্তার কোন সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্টবস্তুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ্ তাআলার একটি সৃষ্টবস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে — أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ, ধন্য সে, যে অগ্নিতে আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরোক্ত কারণেই এর তফসীরে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে, مَن فِي النَّارِ বলে হযরত মূসা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, অগ্নিটি তো সত্যিকার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে মূসা (আঃ) উপস্থিত হয়েছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই মূসা (আঃ) অগ্নির মধ্যে হলেন। وَمَنْ حَوْلَهَا বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে,, مَن فِي النَّارِ বলে ফেরেশতা এবং وَمَنْ حَوْلَهَا বলে হযরত মূসা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ বোঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাসান বসরী (রাঃ)-এর একটি রেওয়ায়েত ও তার পর্যালোচনা ঃ ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুওয়াইহ্ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও সায়ীদ ইবনে জুবায়র থেকে مَن فِي النَّارِ এর তফসীর প্রসঙ্গে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, مَن فِي النَّارِ বলে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র ও মহান সত্তা বোঝানো হয়েছে। বলাবাহুল্য, অগ্নি একটি সৃষ্টবস্তু এবং কোন সৃষ্টবস্তুর মধ্যে স্রষ্টার অনুপ্রবেশ হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তাআলার সত্তা আগুনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল; যেমন অনেক প্রতিমাপূজারী মুশরেক প্রতিমার অস্তিত্বে আল্লাহ্ তাআলার সত্তার অনুপ্রবেশ বিশ্বাস করে। এটা তওহীদের ধারণার নিশ্চিত পরিপন্থী। বরং রেওয়ায়েতের অর্থ আত্মপ্রকাশ করা। উদাহরণতঃ আয়নায় যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তা আয়নার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে না— তা থেকে আলাদা ও বাইরে থাকে। এই আত্মপ্রকাশকে 'তাজাল্লী' তথা জ্যোতি বিকীরণও বলা হয়। বলাবাহুল্য, এই তজল্লী স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার সত্তার তাজল্লী ছিল না নতুবা আল্লাহ্ তাআলার সত্তা মূসা (আঃ) অবলোকন করে থাকলে পরবর্তী সময়ে তাঁর এই আবেদনের কোন অর্থ থাকে না যে, رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আপন সত্তা প্রদর্শন করুন, যাতে আমি দেখতে পারি। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে لَن تَرَىٰنِي বলারও কোন অর্থ থাকে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত উক্তিতে আল্লাহ্ তাআলার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ, অগ্নির আকারে জ্যোতি বিকীরণ বোঝানো হয়েছে। এটা যেমন অনুপ্রবেশ ছিল না, তেমনি সত্তার তাজাল্লীও ছিল না। বরং لَن تَرَىٰنِي উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুজগতে আল্লাহ্ তাআলার সত্তাগত তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করার শক্তি কারও নেই। এমতাবস্থায় এই আত্মপ্রকাশ ও তাজল্লীর অর্থ কি হবে? এর জওয়াব এই যে, এটা "মিছলী" তথা দৃষ্টান্তগত তাজল্লী ছিল, যা সূফী-বুযুর্গদের মধ্যে সুবিদিত। মানুষের পক্ষে এর স্বরূপ বোঝা কঠিন। প্রয়োজনমাফিক কিঞ্চিৎ বোধগম্য করার জন্যে আমি আমার আরবী ভাষায় লিখিত 'আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থের সূরা কাসাসে এর কিছু বিবরণ লিখেছি। উৎসাহী পাঠকগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন। إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ –এর পূর্বের আয়াতে মূসা (আঃ)-এর লাঠির মু'জেযা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথাও বলা হয়েছে যে, লাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেখে মূসা (আঃ) নিজেও ভয়ে পালাতে থাকেন। এরপরও মূসা (আঃ)- এর দ্বিতীয় মু'জেযা সুশুভ্র হাতের বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই ব্যতিক্রম কেন উল্লেখ করা হল এবং এটা استثناء منقطع না متصل – এ সম্পর্কে তফসীরকার গণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ একে منقطع সাব্যস্ত করেছেন। তখন আয়াতের বিষয়বস্তু হবে এই যে, পূর্বের আয়াতে পয়গম্বরগণের মধ্যে ভয় না থাকার কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, যাদের দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, এরপর তওবা করে সৎকর্ম অবলম্বন করে। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যদিও আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করে দেন, কিন্তু ক্ষমার পরেও গোনাহের কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে

তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে استثناء متصل সাব্যস্ত করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্‌র রসূল ভয় করেন না তাদের ব্যতীত, যাদের দ্বারা ত্রুটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ, সগীরা গোনাহ্ হয়ে যায়। এরপর তা থেকেও তওবা করে নেন। এই তওবার ফলে সগীরা গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কারণ, পয়গম্বরগণের যেসব পদস্খলন হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সগীরা কবীরা কোন প্রকার গোনাহ্ নয়। তবে আকার থাকে গোনাহের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইজতিহাদী ভ্রান্তি। এই বিষয়বস্তুর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মূসা (আঃ)-এর দ্বারা কিবতী-হত্যার যে পদস্খলন ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও বিদ্যমান ছিল এবং মূসা (আঃ)-এর মধ্যে ভয়-ভীতি সঞ্চারিত ছিল। এই পদস্খলন না ঘটলে সাময়িক ভয়-ভীতিও হত না।—(কুরতুবী)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا — বলাবাহুল্য, এখানে পয়গম্বরগণের নবুওয়ত রেসালত সম্পর্কিত জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয়; যেমন হযরত দাউদ (আঃ)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নবুওয়ত ও রেসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয় — জিন ও জন্তু-জানোয়ারদের উপরও তাঁরা শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব মহান নেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানরূপী নেয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নেয়ামত অন্যান্য সব নেয়ামতের ঊর্ধ্বে।—(কুরতুবী)

পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় না :

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ বলে এখানে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার বোঝানো হয়েছে —আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন نحن معاشر الانبياء لانورث অর্থাৎ, পয়গম্বরগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাঁদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিযী ও আবু দাউদে হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ وافرا -অর্থাৎ, আলেমগণ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু পয়গম্বরগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে—আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। হযরত আবু আবদুল্লাহ্‌র রেওয়ায়েত এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত সুলায়মান (আঃ)- এর উত্তরাধিকারী।—(রূহুল-মা'আনী) যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো যেতে পারে না। কারণ, হযরত দাউদ (আঃ)-এর ওফাতের সময় তাঁর ঊনিশ জন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বোঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না; বরং একমাত্র সুলায়মান (আঃ) উত্তরাধিকারী হন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ্ তাআলা হযরত দাউদ (আঃ)- এর রাজত্বও হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন, জন্তু, জানোয়ার ও বিহংগকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরিবারস্থ কোন কোন ইমামের বরাত দিয়ে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝাতে চেয়েছেন।—(রূহুল মা'আনী)

হযরত সুলায়মান (আঃ)- এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদীরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। সুলায়মান (আঃ)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী ছিল।—(কুরতুবী)

অহংকারবশতঃ না হলে নিজের জন্যে বহুবচন পদ ব্যবহার করা জায়েয : ----- عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا -হযরত সুলায়মান (আঃ) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্যে বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ও সুলায়মান (আঃ)-এর আনুগত্যে শৈথিল্যও প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্ণর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজের জন্যে বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নেয়ামত প্রকাশের উদ্দেশে হয়।—অংকার ও শ্রেষ্টত্ব প্রদর্শনের জন্যে না হয়।

বিহংগকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি-চেতনা বিদ্যমান : এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশু-পক্ষী ও সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও চেতনা বর্তমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণ মাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলী পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফে (রহঃ) বলেন, পাখীদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কোন বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, যাতে তা অঙ্কুরিত না হয়। এরূপ করে সে শীতকালের জন্যে তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে।—(কুরতুবী)

জ্ঞাতব্যঃ আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে مَنطِقَ الطَّيْرِ অর্থাৎ পক্ষীকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। হুদহুদ পাখী জাতীয় প্রাণী। নতুবা হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে সমস্ত পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলি শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বোঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীরে এস্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোন না কোন উপদেশ বাক্য।

وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ — আভিধানিক দিক দিয়ে كل শব্দের মধ্যে কোন বস্তুর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা শামিল থাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বোঝানো হয় না; বরং কোন বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বোঝানো হয়; যেমন এখানে সেসব বস্তুর ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্যশাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে ছিল না।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾
حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا
مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْۤ اَنْ اَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِىْۤ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَتَفَقَّدَ
الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِىَ لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢٠﴾
لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗۤ اَوْ لَيَاْتِيَنِّىْ بِسُلْطٰنٍ
مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَ
جِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ ۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ
وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا
يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ
الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ
وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾ السجدة

(১৭) সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। — জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল। (১৮) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।' (১৯) তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।' (২০) সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, 'কি হল, হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? (২১) আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ।' (২২) কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে বলল, 'আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে 'সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। (২৩) আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। (২৫) তারা আল্লাহ্‌কে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর। (২৬) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা-আরশের মালিক।'

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ — এটা وزع থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগে আয়াতের فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ — এখানে রেযার অর্থ কবূল। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আমাকে এমন সৎকর্মের তওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবুল হয়। রূহুল মা'আনীতে এর মাধ্যমে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, সৎকর্ম মকবুল হওয়াই জরুরী নয়; বরং এটা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গম্বরগণ তাঁদের সৎকর্মসমূহ মকবুল হওয়ার জন্যেও দোয়া করতেন; যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কাবা গৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا — এতে বোঝা গেল যে, কোন সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা কবূল হওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করাও বাঞ্ছনীয়।

সৎকর্ম মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না : وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ — সৎকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার কৃপা দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হাঁ, আমিও। কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বেষ্টন করে আছে।—(রূহুল-মা'আনী)

হযরত সুলায়মান (আঃ)-ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যে খোদায়ী কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করছেন অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আমাকে সেই কৃপাও দান কর, যদ্দ্বারা জান্নাতের উপযুক্ত হই।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ - تَفَقَّدَ — এর শাব্দিক অর্থ কোন জনসমাবেশে উপস্থিত ও অনুপস্থিতির খবর নেয়া। তাই এর অনুবাদে খোঁজ নেয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা মানব, জিন, জন্তু ও পশু-পক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্যশাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খোঁজ-খবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে- وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ -অর্থাৎ, সুলায়মান (আঃ) তাঁর পক্ষী প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরও এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্যে তশরীফ নিয়ে যেতেন, সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কেউ কোন কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্যে জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্যে শিষ্য ও মুরীদদের খোঁজ-খবর নেয়া জরুরী : আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) সর্বস্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন

এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমন কি, যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাখীর তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি। বরং বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে কম সংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর খেলাফতের আমলে পয়গম্বরগণের এই সুন্নতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লেখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যাঘ্র কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যেও ওমরকে প্রশ্ন করা হবে।—(কুরতুবী)

এ হচ্ছে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের রীতি-নীতি, যা পয়গম্বরগণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যার ফলে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। তাঁদের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ ও সাধারণ বিশ্বের শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি।

مَالِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ — সুলায়মান (আঃ) বললেন, আমার কি হল যে, আমি হুদহুদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না।

আত্মসমালোচনা : এখানে স্থান ছিল একথা বলার—"হুদহুদের কি হল যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই" বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, হুদহুদ ও অন্যান্য পক্ষীকুলের অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ্ তাআলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর মনে এই আশংকা দেখা দিল যে, সম্ভবতঃ আমার কোন ত্রুটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণীর পাখী অর্থাৎ, হুদহুদ গায়ব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হল? সূফী-বুযুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোন নেয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোন কষ্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনের জন্যে বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্ম-সমালোচনা করেন যে, আমা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোন ত্রুটি হল, যদ্দরুন এই নেয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুযুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, اذا فقدوا امالهم تفقدوا اعمالهم অর্থাৎ, তাঁরা যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলীর খবর নেন যে, তাঁদের দ্বারা কি ত্রুটি হয়ে গেছে।

এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা ও চিন্তা-ভাবনার পর সুলায়মান (আঃ) বললেন, أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ —এখানে ام শব্দটি بَلْ —এর সমার্থবোধক।—(কুরতুবী) অর্থাৎ, হুদহুদকে দেখার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ভুল করেনি; বরং সে উপস্থিতই নয়।

পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু হুদহুদকে খোঁজার কি কারণ ছিল? তিনি বললেন, সুলায়মান (আঃ) তখন এমন জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা হুদহুদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত ঝরণাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। হুদহুদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন— قف يا وقاف كيف يرى الهدهد باطن الارض وهو لايرى الفخ حين يقع فيه জ্ঞানীগণ! এই সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখী মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না, যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কারও জন্যে যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তবরূপ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। কোন ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ —প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসুলভ নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে।

যে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শাস্তি দেয়া জায়েয : হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ্ তাআলা জন্তুদেরকে এরূপ শাস্তি দেয়া হালাল করে দিয়েছিলেন; যেমন সাধারণ উম্মতের জন্যে জন্তুদেরকে যবাই করে তাদের মাংস, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখন হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজনমাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেয়া এখনও জায়েয। অন্যান্য জন্তুকে শাস্তি দেয়া আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ।—(কুরতুবী)

أَوْ لَيَأْتِيَنِّيْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ —অর্থাৎ, হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোন উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে, তবে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওযর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত।

أَحَطتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ —অর্থাৎ, হুদহুদ তার ওযর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ, আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পয়গম্বরগণ আলেমুল গায়ব ছিলেন না : ইমাম কুরতুবী বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পয়গম্বরগণ আলেমুল গায়ব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِيْنٍ —'সাবা' ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ শহর, যার অপর নাম মাআরিবও। সাবা ও ইয়ামনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিন দিনের দূরত্ব ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চাইতে বেশী? : হুদহুদের উপরোক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোন শাগরেদ তার ওস্তাদকে এবং আলেম নয় এমন কোন ব্যক্তি

আলেমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চাইতে আমার বেশী—যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চাইতে বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু রূহুল মাআনীতে বলা হয়েছে, পীর ও মুরুব্বীদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার-বিরোধী। কাজেই বর্জনীয়। হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ, সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং ওযরকে জোরদার করার জন্যে এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোন কথা বললে তাতে দোষ নেই।

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ —অর্থ আমি এক নারীকে পেয়েছি, সে সাবা সম্প্রদায়ের রাণী। অর্থাৎ, তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সম্রাজ্ঞীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান।—(কুরতুবী)। তার পিতামহ হুদহুদ ছিল সমগ্র ইয়ামনের একচ্ছত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্র-সন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবাহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলে-কৌলিন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়।—(কুরতুবী) প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান স্বীকার করেনি। সম্ভবতঃ এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ্ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি?ঃ এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তাঁরা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করেন না। ইবনে আরাবী তাঁর তফসীর গ্রন্থে বলেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানব জাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্যে হালাল কিনা? এতে ফেকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েয বলেছেন। কেউ কেউ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ "আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান" কিতাবে উল্লেখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরীয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানব নন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়েতে সুলায়মান (আঃ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বিলকীস নিজে জিন ছিল না। সুলায়মান (আঃ)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পরে আসছে।

নারীর জন্যে বাদশাহ্ হওয়া অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েয কিনা?ঃ সহীহ্ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন, لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة অর্থাৎ, যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খেলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং নামাযের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ, শাসন-কর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রাজ্ঞী হওয়া দ্বারা ইসলামী শরীয়তের কোন বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। একথা কোন সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ —অর্থাৎ, কোন সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্যে যেসব সাজ সরঞ্জাম দরকার, তা সবই বিদ্যমান ছিল। সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থী নয়।

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ —আরশের শাব্দিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল এবং মোতি, ইয়াকুত ও মণিমাণিক্য দ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরের অভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ - -এতে জানা গেল যে, বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজারী ছিল। তারা সূর্যের এবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, অগ্নিপূজারী ছিল।-(কুরতুবী)

أَلَّا يَسْجُدُوا - এর সম্পর্ক وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ অথবা فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ এর সাথে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে সেজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, আল্লাহ্‌কে সেজদা করবে না।

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ اذْهَب بِّكِتَابِي
هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ
يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾
قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا
حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ
وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ
إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَ
كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا
آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ارْجِعْ
إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا
أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا
قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ
بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

(২৭) সুলায়মান বললেন, 'এখন আমি দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী। (২৮) তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়।' (২৯) বিলকীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। (৩০) সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই : অসীম দাতা, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু; (৩১) আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।' (৩২) বিলকীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।' (৩৩) তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন।' (৩৪) সে বলল, 'রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে। (৩৫) আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে।' (৩৬) অতঃপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বললেন, তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। (৩৭) ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত। (৩৮) সুলায়মান বললেন, হে পারিষদবর্গ, 'তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? (৩৯) জনৈক দৈত্য-জিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজ-কারবারে শরীয়তসম্মত দলীলঃ اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا — হযরত সুলায়মান (আঃ) সাবার সম্রাজ্ঞীর কাছে পত্র প্রেরণকে তাঁর সাথে দলীল সম্পন্ন করার জন্যে যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বোঝা গেল যে, সাধারণ কাজ-কারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যে ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ জরুরী, ফেকাহ্‌বিদগণ সেক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেননি। কেননা, পত্র, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোন আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।

কাফেরদের মজলিস হলেও সব মজলিসে মানবিক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত ঃ فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ — হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসের এই শিষ্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকবে না; বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম। এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ — كَرِيمٌ — এর শাব্দিক অর্থ সম্মানিত; সম্ভ্রান্ত। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোন পত্রকে তখনই বলা হয়, যখন তা মোহরাঙ্কিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে كِتَابٌ كَرِيمٌ এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, যুহায়র প্রমুখ كتاب مختوم অর্থাৎ "মোহরাঙ্কিত পত্র" দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) পত্রের উপর তাঁর মোহর অঙ্কিত করেছিলেন। আমাদের রসূল (সাঃ) যখন অনারব বাদশাহ্দের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহ্দের পত্রের জন্যে মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সার ও কেসরার পত্রে মোহর অঙ্কিত করে দেন। এতে বোঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনভেলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভেলাপে পুরে প্রেরণ করা সুন্নতের নিকটবর্তী।

সুলায়মান (আঃ)-এর পত্র কোন্ ভাষায় ছিল ঃ হযরত সুলায়মান (আঃ) আরব ছিলেন না; কিন্তু আরবী ভাষা জানা ও বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি পক্ষীকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সে ক্ষেত্রে আরবী ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটেও অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আঃ) আরবী ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ, প্রাপক (বিলকীস) আরব বংশোদ্ভূত ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, সুলায়মান (আঃ) তাঁর মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দো'ভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল।—(রূহুল মা'আনী)

পত্র লেখার কতিপয় আদব ঃ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ কোরআন পাক মানব জীবনের কোন দিক সম্পর্কেও দিক নির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়। এ স্থলে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গম্বরের চিঠি। কোরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্রে পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যেও অনুসরণীয়।

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এর পর প্রাপকের ঃ এই পত্রে সর্বপ্রথম দিক নির্দেশ এই যে, পত্রটি সুলায়মান (আঃ) নিজের নাম দ্বারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেন, কোরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণতঃ পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে এরূপ খোঁজাখুঁজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। তিনি من محمد عبد الله ورسوله এ কথার মাধ্যমে পত্র শুরু করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোন বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, ওস্তাদ, পীর অথবা কোন মুরুব্বীর কাছে পত্র লেখে, তখন নাম অগ্রে থাকা আদবের খেলাফ হবে না কি? তার এরূপ করা উচিত কিনা? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্ম-ধারা বিভিন্নরূপ। অধিকাংশ সাহাবী সুন্নতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রূহুল মা'আনীতে বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস (রাঃ)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে—

ما كان احد اعظم حرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اصحابه اذا كتبوا اليه كتابا بدأوا بانفسهم قلت وكتاب علاء الحضرمى يشهد له على ماروى .

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চাইতে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিল না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নামে আলায়ী হাযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তবে রূহুল মা'আনীতে উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম অনুত্তম সম্পর্কে —বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েয। ফকীহ্ আবুল-লাইস 'বুস্তান' গ্রন্থে বলেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে, তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্দ্বিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জওয়াব দেয়াও পয়গম্বরগণের সুন্নত ঃ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জওয়াব দেয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জওয়াবকে সালামের জওয়াবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন।—(কুরতুবী)

চিঠিপত্রে বিস্‌মিল্লাহ্ লেখা ঃ হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লেখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এখন বিস্‌মিল্লাহ্ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে না পরে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্রাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, বিস্‌মিল্লাহ্ সর্বাগ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কোরআন পাকে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর নাম পূর্বে ও বিস্‌মিল্লাহ্ পরে লিখিত আছে। বাহ্যতঃ এ থেকে বিস্‌মিল্লাহ্ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেনঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان بن داود الى بلقيس ابنة ذى شرح وقومها . ان لاتعلوا الخ .

বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় সুলায়মান (আঃ)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। কোরআন পাকে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। সুলায়মান (আঃ)-এর আসল পত্রে বিস্‌মিল্লাহ্ আগে ছিল না পরে, কোরআনে এ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আঃ)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভেতরে বিস্‌মিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। পত্র শোনানোর সময় বিলকীস সুলায়মান (আঃ)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্নতঃ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ শব্দটি فتوى থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া। এখানে পরামর্শ দেয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন সুলায়মান (আঃ)-এর পত্র পৌঁছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত। সে তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য একথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল, نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ — হযরত কাতাদা বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ-সভার সদস্য তিনশ' তের জন ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন। ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর কাছে ওহী আগমন করত এবং তিনি খোদায়ী নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে কোন পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না; কিন্তু উম্মতের জন্যে সুন্নত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশে তাঁকেও আদেশ করা হয়েছে وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ – অর্থাৎ, আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কেরামের

সাথে পরামর্শ করুন। এতে একদিকে যেমন সাহাবায় কেরামের সন্তুষ্টি বিধান করা হয়। অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার তাকীদও হয়ে যায়।

সুলায়মান (আঃ)-এর পত্রের জওয়াবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়াঃ রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরীক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন করার পর সম্রাজ্ঞী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল ঃ হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র পয়গম্বর কি-না। তিনি আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, না তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাট? এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবেলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এইরূপ স্থির করল যে, সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তু ইবনে জরীর একাধিক সনদে হযরত ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। একথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ — অর্থাৎ, আমি সুলায়মান ও তাঁর সভাসদদের কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব; যেসব দূত উপঢৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে।

সুলায়মান (আঃ) বিলকীসের উপঢৌকন গ্রহণ করলেন না ঃ

قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

-অর্থাৎ, যখন বিলকীসের দূত উপঢৌকন নিয়ে সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে পৌছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও?

আমাকে আল্লাহ্ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছে, তা তোমাদের অর্থ-সম্পদের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি এই উপঢৌকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরা সুখী থাক।

কোন কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয কিনা? ঃ হযরত সুলায়মান (আঃ) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপঢৌকন কবূল করেননি। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নয় অথবা ভাল নয়। মাসআলা এই যে, কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোন স্বার্থ বিঘ্নিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নয়। —(রূহুল মা'আনী) হাঁ, যদি উপঢৌকন গ্রহণ করলে কোন ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়; যেমন এর মাধ্যমে কোন কাফের ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোন অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবূল করার অবকাশ আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোন কোন কাফেরের উপঢৌকন কবূল করেছেন এবং কারও কারও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বোখারীর টীকা 'উমদাতুল কারী'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত কা'ব ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালেক কাফের মুশরিক অবস্থায় কোন প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে দু'টি অশ্ব এবং দু'টি বস্ত্রজোড়া উপঢৌকন হিসেবে পেশ করল। তিনি একথা বলে তার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপঢৌকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপঢৌকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার উপঢৌকন একথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন কোন মুশরিকের উপঢৌকন কবূল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রীষ্টান একটি অত্যুজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবূল করেন।

এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল-আয়েম্মা বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কারও কারও উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারও কারও উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে তার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপঢৌকন কবূল করেছেন।—(উমদাতুল-কারী)

বিলকীস উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্যে মুশরিকের উপঢৌকন কবূল করা জায়েয নয়, বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘুষ হিসেবে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিল, যাতে এর মাধ্যমে সে সুলায়মান (আঃ)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।

সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি ঃ কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে লেখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। সুলায়মান (আঃ)- এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে, সুলায়মান দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোন সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহ্‌র পয়গম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। একথা বলে সে সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে হাযির হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী, সম্রাজ্ঞী বিলকীস সদল-বলে আগমন করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, যখন সে সুলায়মান (আঃ)- এর দরবার থেকে ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল, তখন হযরত সুলায়মান (আঃ) তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন,

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

সুলায়মান (আঃ) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ
اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ
هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۖ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ
شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ
كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ
مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا
عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ
كُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ
فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ
صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَ
اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى
ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ
يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

(৪০) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল। (৪১) সুলায়মান বললেন, বিলকীসের সামনে তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই? (৪২) অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি। (৪৩) আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার এবাদত করত, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয় সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৪৪) তাকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকীস বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। (৪৫) আমি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহ্কে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর। অতঃপর তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হল। (৪৬) সালেহ্ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণ কামনা করছ কেন? তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন? সম্ভবতঃ তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে।

ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গম্বরসুলভ মু'জেযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মু'জেযা দান করেছিলেন। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাআলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌঁছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনরূপে এখানে পৌঁছা দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদের মধ্যে জিনও ছিল) সম্বোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেয়াও সম্ভবতঃ এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এত দূরবর্তী স্থানে পৌঁছে যাওয়া আল্লাহ্ তাআলার অগাধ শক্তি বলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ — مسلمين শব্দটি مسلم — এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আত্মসমর্পণকারী, অনুগত। কারণ, তখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কোরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষা থেকে তাই বোঝা যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ – অর্থাৎ, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল। এই ব্যক্তি কে? এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা যে, স্বয়ং সুলায়মান (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জেযা এবং বিলকীসকে পয়গম্বরসুলভ মু'জেযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু কাতাদা প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে ইবনে জরীর বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি সুলায়মান (আঃ)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলায়মান (আঃ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে তাঁর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি ইসমে আযম জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যাই চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরী নয় যে, সুলায়মান (আঃ) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা, এটা অবাস্তব নয় যে, সুলায়মান (আঃ) তাঁর এই মহান কীর্তি তাঁর উম্মতের কোন ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরও বেশী প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ —(ফুসূসুল

হেকাম) এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হবে।

মু'জেযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য ঃ প্রকৃত সত্য এই যে, মু'জেযার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার কাজ। কোরআন পাকে বলা হয়েছে —

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى – – কারামতের অবস্থাও হুবহু তদ্রূপ। এতেও স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে কোন কাজ হয়ে যায়। মু'জেযা ও কারামত — এ উভয়টিরই প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোন অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পয়গম্বরের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে মু'জেযা বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়ায়েত সহীহ্ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি সুলায়মান (আঃ)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলী তাঁর পয়গম্বরের গুণাবলীর প্রতিবিম্ব এবং তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উম্মতের ওলীদের হাতে যেসব কারামত প্রকাশ পায়, সেগুলো পয়গম্বরের মু'জেযারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত না তাসাররুফ ঃ শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করা। এর জন্যে নবী, ওলী এমন কি মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গম্বরগণ তাসাররুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সুলায়মান (আঃ) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোরআন পাক এই তাসাররুফকে عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ (কিতাবের জ্ঞান) – এর ফলশ্রুতি বলেছে। এতে এই অর্থই অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোন দোয়া অথবা ইসমে আযমের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোন সম্পর্ক নেই ; বরং এটা কারামতেরই সমার্থবোধক।

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ – আমি এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব—আসিফের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা, কারামত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জওয়াব এই যে, সম্ভবত ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি একাজ এত দ্রুত করে দেব।

সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছিল যে, সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কোরআন পাক নিশ্চুপ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উয়ায়নাকে জিজ্ঞেস করল, সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, তার ব্যাপার وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কোরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব, আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবনে আসাকির হযরত ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যান এবং তাকে তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রতি মাসে হযরত সুলায়মান (আঃ) সেখানে গমন করতেন এবং তিন দিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান (আঃ) বিলকীসের জন্যে ইয়ামনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন বলেও বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ بَلْ
أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ
أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾
وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ
بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾
وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ
لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَئِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ
لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَ
أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ
عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

(৪৭) তারা বলল, 'তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি।' সালেহ্ বললেন, 'তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্র কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।' (৪৮) আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং সংশোধন করত না। (৪৯) তারা বলল, 'তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব। অতঃপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী। (৫০) তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (৫১) অতএব, দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নেস্তনাবুদ করে দিয়েছি। (৫২) এই তো তাদের বাড়ীঘর—তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন আছে। (৫৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং পরহেযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (৫৪) স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ! (৫৫) তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়। (৫৬) উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো, 'লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাকপবিত্র সাজতে চায়। (৫৭) অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। (৫৮) আর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম মুষলধারে বৃষ্টি। সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্মক ছিল সে বৃষ্টি। (৫৯) বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে! আল্লাহ্, না ওরা—তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تِسْعَةُ رَهْطٍ – رهط শব্দের অর্থ দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই رهط বলার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হত এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজ্‌র জনপদের প্রধান। হিজ্‌র শামদেশের একটি স্থানের নাম।

لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবীদার তদন্ত করলে আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। একথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব। কারণ, রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফেরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশরা কুফর, শিরক, হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গোনাহ্! বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা সালেহ্ (আঃ)-এর ওলী তথা দাবীদার বলেছে, সে তো সালেহ্ (আঃ)-এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যা তালিকার বাইরে কেন রাখল? জওয়াব এই যে, সম্ভবতঃ সে পারিবারিক দিক দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। সালেহ্ (আঃ) ও তাঁর স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবী করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল, কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেয়া হয়েছে।

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রসূলে করীম (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ, আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরও আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারও কারও মতে এই বাক্যটিও লূত (আঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে। আয়াতে الَّذِينَ اصْطَفَىٰ বাক্যে বাহ্যতঃ পয়গম্বরগণকেই বোঝানো হয়েছে; যেমন অন্য আয়াতে وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এখানে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। সুফিয়ান সওরী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে الَّذِينَ اصْطَفَىٰ বলে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্যে 'আলাইহিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহযাবের صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ্ তাআলা এ

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ
لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّنْ يَّهْدِيكُمْ فِي ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّنْ يَّبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٦٤﴾
قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي
الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

(৬০) বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব, আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্য বিচ্যুত সম্প্রদায়। (৬১) বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। (৬২) বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। (৬৩) বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে। (৬৪) বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও মর্ত্য থেকে রিযিক দান করেন। সুতরাং আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। (৬৫) বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে। (৬৬) বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে; বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।

সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে।

মাসআলা ঃ এই আয়াত থেকে খোতবার রীতিনীতিও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও পয়গম্বরগণের প্রতি দরূদ ও সালাম দ্বারা খোতবা শুরু হওয়া উচিত। রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সকল খোতবা এভাবেই শুরু হয়েছে। বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহ্র হাম্দ ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম সুন্নত ও মোস্তাহাব।—(রূহুল-মাআ'আনী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ - مضطر শব্দটি اضطرار থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন অভাব হেতু অপারক ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই হয়, যখন কোন হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে مضطر বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। এই তফসীর সুদ্দী, যুননুন মিসরী, সহ্ল ইবনে আবদুল্লাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন ঃ

اللهم رحمتك ارجو فلا تكلنى الى نفسي طرفة عين واصلح لـى شانى كله لا اله الا انت ইয়া আল্লাহ্, আমি তোমার রহমত আশা করি। অতএব, আমাকে মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।—(কুরতুবী)

নিঃসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয় ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, আল্লাহ্ তাআলা নিঃসহায়ের দোয়া কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দোয়া করা এখলাস। আল্লাহ্ তাআলার কাছে এখলাসের বিরাট মর্তবা। মুমিন, কাফের, পরহেযগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছ থেকেই এখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহ্র রহমত নিবিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ এখলাস সহকারে আল্লাহ্কে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের দোয়া কবুল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক সহীহ্ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়—এতে কোন সন্দেহ নেই। (এক) উৎপীড়িতের দোয়া, (দুই) মুসাফিরের দোয়া এবং (তিন) সন্তানের জন্যে বদ-দোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, এই দোয়াত্রয়ের মধ্যেও কবুল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব বিদ্যমান আছে। কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি যখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্যে আল্লাহ্কে ডাকে, তখন সে-ও নিঃসহায়ই

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا ءَإِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ أَئِنَّا
لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ
قَبْلُ إِنْ هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾
وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ
عَسٰٓى أَنْ يَّكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا
يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي
كِتٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيٓ
إِسْرَآءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ
لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

(৬৭) কাফেররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? (৬৮) এই ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ কিছু নয়। (৬৯) বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭০) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে মনঃক্ষুন্ন হবেন না। (৭১) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? (৭২) বলুন, অসম্ভব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিয়দংশ তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে। (৭৩) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন। (৭৫) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে। (৭৬) এই কোরআন বনী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে। (৭৭) এবং নিশ্চিতই এটা মুমিনদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। (৭৮) আপনার পালনকর্তা নিজ শাসনক্ষমতা অনুযায়ী তদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। (৭৯) অতএব, আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন।

হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন ও দরদী স্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্যে পিতাসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের কারণে কখনও বদ-দোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে আল্লাহ্কে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবু যর (রাঃ)-এর জবানী রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্র উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনও রদ করব না, যদিও সে কাফের হয়।—(কুরতুবী) যদি কোন নিঃসহায়, মজলুম; মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবুল হয়নি, তবে কু-ধারণার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও রহস্য ও উপকারিতাবশতঃ দেরীতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার এখলাস ও আল্লাহ্র প্রতি মনোযোগে কোন ত্রুটি আছে কিনা।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ — রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশতা, যত মখলুক পৃথিবীতে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন, জাতি ইত্যাদি—তাদের কেউ গায়বের খবর জানে না, আল্লাহ্ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, গায়ব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ—এতে কোন ফেরেশতা অথবা নবী-রসূলও শরীক হতে পারে না। এ বিষয়ের জরুরী ব্যাখ্যা সূরা আনআমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ

ادّٰرَكَ — শব্দে বিভিন্ন রূপের কেরাআত আছে এবং অর্থ সম্পর্কেও নানা জনের নানা উক্তি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তফসীরের কিতাবাদিতে এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতটুকু বুঝে নেয়া যথেষ্ট যে, কোন কোন তফসীরকার ادّٰرَكَ শব্দের অর্থ নিয়েছেন **تكامل** অর্থাৎ, পরিপূর্ণ হওয়া এবং فِي الْاٰخِرَةِ -কে ادّٰرَكَ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করেছেন যে, পরকালে এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোন কাজে লাগবে না। কারণ, দুনিয়াতে তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। পক্ষান্তরে কোন কোন তফসীরকারের মতে ادّٰرَكَ শব্দের অর্থ **ضل** ও **غاب** এবং فِي الْاٰخِرَةِ শব্দটি عِلْمُهُمْ—এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে পারেনি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কেয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর। এতে কোন যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার সাথে এর অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা পয়গম্বরগণের ও ঐশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা কোরআন এবং কোরআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমন কি, বনী-ইসরাঈলের

امن خلق ٢٠ ٣٨٥ النمل ٢٧

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا
وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ
إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ وَ
إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ
تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَ
يَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ
بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم
بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنفَخُ
فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ
تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ
الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

(৮০) আপনি আহবান শোনাতে পারবেন না মৃতদেরকে এবং বধিরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (৮১) আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে সৎপথে আনতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। অতএব, তারাই আজ্ঞাবহ। (৮২) যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না। (৮৩) যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে সেসব সম্প্রদায় থেকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। (৮৪) যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে? অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। না তোমরা অন্য কিছু করেছিলে? (৮৫) জুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের ওয়াদা এসে গেছে। এখন তারা কোন কিছু বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিনকে করেছি আলোকময়। নিশ্চয় এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮৭) যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়। (৮৮) তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে। এটা আল্লাহ্র কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগতআছেন।

আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত, কোরআন পাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলাবাহুল্য, যে আলেমদের মতবিরোধে বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরী। এতে বোঝা গেল যে, কোরআন সর্বাধিক জ্ঞান-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন। কেননা, আল্লাহ্ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তা নিশ্চিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র মানব জাতির প্রতি রসূলে করীম (সাঃ)-এর স্নেহ, মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহ্র পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবূল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারও সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই কোরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে وَلَا تَحْزَنْ এবং وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ বাক্যসমূহ এই সান্ত্বনা প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সান্ত্বনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবুল করেনি, তাতে আপনার কোন দোষ ও ত্রুটি নেই, যদ্দরুন আপনি দুঃখিত হবেন ; বরং তারা কবুল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। (এক) তারা সত্য কবুল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারও কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। (দুই) তাদের উদাহরণ বধিরের মত, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। (তিন) তারা অন্ধের মত। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছেঃ

إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ —অর্থাৎ, আপনি তো কেবল তাদেরকে শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে অওয়াজ পৌঁছা নয় ; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কোরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত করেছে। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে—আয়াতের এই বাক্যে যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌঁছানোই হত, তবে কোরআনের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা, কাফেরদের কানে আওয়াজ পৌঁছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জওয়াব দেয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, মৃতরা যদি কোন সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবুলও করতে চায়, তবে

এটা তাদের জন্যে উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরযখ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফেরই ঈমান ও সৎকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে, কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারও কোন কথা শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিশ্চুপ। মৃতরা কারও কথা শুনতে পারে কিনা, এটা স্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা ঃ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যেসব বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোরআন পাকে প্রথমতঃ এই সূরা নামলে এবং দ্বিতীয়তঃ সূরা রূমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতেরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ —অর্থাৎ , যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

উক্ত আয়াতত্রয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না ; তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সে জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তারা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। আয়াত এই ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىھُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ

يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্যে প্রযোজ্য—সাধারণ মৃতদের জন্যে নয়, তবে এর জওয়াব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতিও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকী থাকতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্ক দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ্ তাআলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন। মৃত ব্যক্তিরও শ্রবণ করার ক্ষমতা থাকতে পারে, এই মতের প্রবক্তা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের উক্তিও একটি সহীহ্ হাদীসের উরপ ভিত্তিশীল। হাদীস এই ঃ

ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الارد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ্ তাআলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জওয়াব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জওয়াব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হল। (এক) মৃতরা শুনতে পারে এবং (দুই) তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ্ তাআলা মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জওয়াব দেয়ার শক্তি দান করেন। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো শোনবে কিনা। তাই ইমাম গাযযালী ও আল্লামা সুবকী প্রমুখের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সহীহ্ হাদীস ও উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথা-বার্তা শোনে, কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা একসময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং অন্য সময় শোনতে পারে না। এটাও সম্ভব যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের কথা শোনে না, অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা, সূরা নমল, সূরা রূম ও সূরা ফাতেরের আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয় ; বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ্ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে—অকাট্যরূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

ভূগর্ভের জীব কি, কোথায় এবং কবে নির্গত হবে ঃ মুসনাদে আহমদে হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, (২) ধুম্র নির্গত হওয়া, (৩) অদ্ভুত একটি জীবের আবির্ভাব হওয়া, (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, (৫) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, (৬) দাজ্জাল, (৭) তিনটি চন্দ্র গ্রহণ—(এক) পশ্চিম, (দুই) পূর্বে এবং (তিন) আরব উপদ্বীপে ; (৮) এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্যে অবস্থান করবে, অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের নিটকবর্তী সময়ে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। دابة শব্দের تنوين -এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তুটি অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট হবে। আরও জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মোতাবেক জন্মগ্রহণ করবে না ; বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কেয়ামতের

সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর আবু দাউদ তায়ালিসির বরাত দিয়ে হযরত তালহা ইবনে-ওমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে-হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মকামে ইব্রাহীমের মাঝখানে পৌঁছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন এঁকে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে।—(ইবনে-কাসীর) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য উপরে উঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদ্বয়ের মধ্যে যে-কোন একটি প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।—(ইবনে-কাসীর)

শায়খ জামালুদ্দীন মহল্লী বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়।—(মাযহারী) এ স্থলে ইবনে-কাসীর প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে, অতঃপর সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়ের উপরই বিশ্বাস রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরী নয় এবং তাতে কোন উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে কেউ কেউ বলেন যে, কোরআনে উল্লেখিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ, أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ এই বাক্যটি সে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই ঃ অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করবে না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সে সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনতঃ ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে।—(ইবনে-কাসীর)

فَهُمْ يُوزَعُونَ এ শব্দটি وزع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেয়া। অর্থাৎ, অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোক তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ وزع শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেয়া। অর্থাৎ, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ ; বিশেষতঃ যখন কেউ চিন্তা-ভাবনাও ও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের সন্ধান পায় না এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ, এগুলো এমন জাজ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা হবে না।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ - - - فَفَزِعَ শব্দের অর্থ অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে فزع শব্দের পরিবর্তে صعق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে সিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, সিঙ্গার ফুঁক দেয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদাহ্ প্রমুখ তফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যারপর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীতবিহ্বল অবস্থায় উত্থিত হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিন বার সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কোরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।—(কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) ইবনে মোবারক হাসান বসরী (রঃ) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে।—(কুরতুবী)

إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীতবিহ্বল হবে না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনরুজ্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না।—(কুরতুবী) সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাঁধা অবস্থায় আরশের চারি পার্শ্বে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গম্বরগণ আরও উত্তমরূপে এই শ্রেণীভুক্ত। কারণ, তাঁদের জন্যে রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর নবুওয়তেরমর্যাদাও।—(কুরতুবী)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘ-মালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সে বস্তু যখন কোন একদিকে চলমান হয় তখন তা যতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কাল মেঘে সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এরূপ কাল মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়।

মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই সাব্যস্ত করেছেন।

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ - صنع শব্দের অর্থ কারিগরিবিদ্যা,

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ
اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ۗ هَلْ
تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ
الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾ وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ وَّهِىَ ثَمَانٍ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّتِسْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ
مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣﴾ اِنَّ فِرْعَوْنَ
عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً
مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا
فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥﴾

(৮৯) যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (৯০) এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধঃমুখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে। (৯১) আমি তো কেবল এই নগরীর প্রভুর এবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন। এবং সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আজ্ঞাবহদের একজন হই। (৯২) এবং যেন আমি কোরআন পাঠ করে শোনাই। পর যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি বলে দিন, আমি তো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী। (৯৩) এবং আরও বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। সত্বরই তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। এবং তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা গাফেল নন।

সূরা আল-কাসাস

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৮৮

দয়াময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

(১) ত্বা-সীন-মীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) আমি আপনার কাছে মূসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে। (৪) ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী। (৫) দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার।

শিল্প। اتقن শব্দটি اتقان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন কিছুকে মজবুত ও সংহত করা। বাহ্যতঃ এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, দিবারাত্রির পরিবর্তন এবং সিঙ্গার ফুৎকার থেকে নিয়ে হাশর-নশর পর্যন্ত সব অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, এগুলো মোটেই বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, এগুলোর স্রষ্টা কোন সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফেরেশতা নয় ; বরং বিশ্বজাহানের পালনকর্তা। যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً আয়াতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল, কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়াও মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা, এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا এটা হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা, حسنة বলে এখানে কলেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বোঝানো হয়েছে—(কাতাদাহর উক্তি)। কেউ কেউ সাধারণ এবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলাবাহুল্য, সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ঈমান বিদ্যমান থাকে। 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে জান্নাতের অক্ষয় নেয়ামত এবং আযাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, এক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।—(মাযহারী)

وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ – فَزَعٍ বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানী বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহ্‌ভীরু পরহেযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয় ; যেমন কোরআন পাক বলে اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ অর্থাৎ, পালনকর্তার আযাব থেকে কেউ নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণেই পয়গম্বরগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও ওলীগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন। কিন্তু সেদিন হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে।

رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে بلدة বলে মক্কা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মক্কার পালনকর্তা বলার কারণ মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। حرم শব্দটি تحريم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাধারণ সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পবিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েয নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয়। এসব বিধানের কতকাংশ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا আয়াতে, কতকাংশ সূরা মায়েদার শুরুতে এবং কতকাংশ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

সূরা আন-নামল সমাপ্ত

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
مِنْهُمْ مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ
أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا
تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ
امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ
عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ
لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ
هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ
نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

(৬) এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত। (৭) আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব। (৮) অতঃপর ফেরাউন-পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। (৯) ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না। (১০) সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্বাসীগণের মধ্যে। (১১) তিনি মূসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছন পেছন যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল। (১২) পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগিনী বলল, 'আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী? (১৩) অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।

সূরা আল-কাসাস

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মক্কা ও জুহ্ফা (রাবেগ)-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সফরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন জুহ্ফা অর্থাৎ, রাবেগের নিকটে পৌছেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ মনে পড়ে বৈ-কি। অতঃপর জিবরাঈল তাঁকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার শেষভাগে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে আয়াতটি এইঃ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ সূরা কাসাসে সর্বপ্রথম মূসা (আঃ)-এর কাহিনী প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অর্ধেক সূরা পর্যন্ত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী ফেরাউনের সাথে এবং শেষভাগে কারূনের সাথে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী সমগ্র কোরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহ্ফে তাঁর কাহিনী খিযির (আঃ)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। এরপর সূরা তোয়াহায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এরই কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে অতঃপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা তোয়াহায় মূসা (সাঃ)-এর জন্যে বলা হয়েছে وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا -ইমাম নাসায়ী প্রমুখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً .... এই আয়াতে বিধিলিপির মোকাবেলায় ফেরাউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখার ভিত্তিতে ফেরাউন শঙ্কিত হয়েছিল এবং যার কারণে বনী-ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ্ তাআলা এই ফেরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত করালেন এবং জননীর মনস্তুষ্টির জন্যে তারই কোলে বিস্ময়কর পন্থায় পৌছে দিলেন। তদুপরি ফেরাউনের কাছ থেকে স্তন্যদানের খরচ যা, কোন কোন রেওয়ায়েতে দৈনিক এক দীনার বর্ণিত হয়েছে—আদায় করা হয়েছে। স্তন্যদানের এই বিনিময় একজন কাফের হরবীর কাছ থেকে তার সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোনরূপ ত্রুটি নেই। যে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল, অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে অগ্নেয়গিরির এক ভয়ংকর লাভা হয়ে বিস্ফোরিত হল এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তাআলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ থেকে مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ পর্যন্ত আয়াতের সারমর্ম তাই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ -শব্দটি এখানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—নবুওয়তের ওহী বোঝানো হয়নি।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ
أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا
مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ
عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ
إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا
يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ
لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ
بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي
كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا
فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ
رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ
يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾

(১৪) যখন মূসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানদান করলাম! এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি! (১৫) তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্য জন তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। (১৬) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৭) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (১৮) অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে চীৎকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মূসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। (১৯) অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তখন সে বলল, গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সে রকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। (২০) এসময় শহরের প্রান্ত থেকে একব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল, হে মূসা, রাজ্যের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব, তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ – اشد -এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌঁছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে, যখন তার অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই اشد বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারও দেরীতে। কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে اشد এর যমানা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিরতিকাল। একে শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, استوى তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে।—(রূহুল-মা'আনী, কুরতুবী)

آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا – حكم বলে নবুওয়ত ও রেসালত এবং علم বলে বিধি-বিধানের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا –অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে مدينة বলে মিসর নগরী বোঝানো হয়েছে। এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা গেল যে, মূসা (আঃ) মিসরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন এমন সময়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল। অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে মূসা (আঃ) তাঁর সত্য ধর্ম প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এরই ফলে কিছু লোক তাঁর অনুগত হয়েছিল। তাঁদেরকে তাঁর অনুসারীদল বলা হত। مِن شِيعَتِهِ শব্দটি এর সাক্ষ্য দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে-ইসহাক ও ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, মূসা (আঃ) যখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্য ধর্মের কিছু কিছু কথা মানুষকে বলতে শুরু করলেন, তখন ফেরাউন তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু স্ত্রী আসিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। এরপর মূসা (আঃ) অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিসর নগরীতে আগমন করতেন। عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا বলে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে দুপুর বোঝানো হয়েছে। এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত।—(কুরতুবী)

فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ – وكز শব্দের অর্থ ঘুষি মারা। فَقَضَىٰ عَلَيْهِ –বাক পদ্ধতিতে قضاء ও فَقَضَىٰ عَلَيْهِ তখন বলা হয়, যখন কারও ভবলীলা সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেয়া হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা।—(মাযহারী)

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ –এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, মূসা (আঃ) থেকে অনিচ্ছায় প্রকাশিত কিবতী-হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর নবুওয়ত ও রেসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থী এবং তাঁর পয়গম্বরসুলভ মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে তাঁর গোনাহ্ সাব্যস্ত করে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলাও ক্ষমা

করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফের শরীয়তের পরিভাষায় হরবী কাফের ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা, সে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী তথা আশ্রিত ছিল না এবং মূসা (আঃ)-এর সাথেও তার কোন চুক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় মূসা (আঃ) একে 'শয়তানের কাজ' ও গোনাহ্ কেন সাব্যস্ত করেছেন? এর হত্যা তো বাহ্যতঃ সওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ, সে একজন মুসলমানের উপর জুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্যে এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোন সময় লিখিত হয় এবং কোন সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণতঃ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যিম্মীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

কার্যগত চুক্তি এরূপ : যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোন রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয়পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে, সেইস্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তি গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়।

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েয হত না, কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেন নি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার জুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবতঃ হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। মূসা (আঃ) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে আরও কম মাত্রার প্রহারও যথেষ্ট ছিল কাজেই এই বাড়াবাড়ি তাঁর জন্যে জায়েয ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য : এটা হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর সুচিন্তিত অভিমত, যা তিনি আরবী ভাষায় 'আহকামুল কোরআন'—সূরা কাসাস লেখার সময় ব্যক্ত করেছিলেন। এটা তাঁর সর্বশেষ গবেষণার ফল। কেননা, ১৩৬২ হিজরীর ২রা রজব তারিখে তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি.......।

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল, কিন্তু পয়গম্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করেন না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এক্ষেত্রে মূসা (আঃ) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গোনাহ্ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।—(রূহুল-মা'আনী)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ — হযরত মূসা (আঃ)-এর এই বিচ্যুতি আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করণার্থে আরয করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বোঝা গেল যে, মূসা (আঃ) যে ইসরাঈলীর সাহায্যার্থে একাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে নিজেই কলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ স্থলে مجرمين (অপরাধী)-এর তফসীরে كافرين (কাফের) বর্ণিত আছে। কাতাদাহ্-এর বক্তব্যও এর কাছাকাছি। এই তফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, মূসা (আঃ) যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। মূসা (আঃ)-এর এই উক্তি থেকে দু'টি মাসআলা প্রমাণিত হয়।

(১) মজলুম কাফের ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। (২) কোন জালেম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েয নয়। আলেমগণ এই আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার চাকুরীকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, এতে জুলুমে অংশগ্রহণ বোঝা যায়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।—(রূহুল-মা'আনী) কাফের অথবা জালেমদের সাহায্য-সহযোগিতার নানাবিধ পন্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফেকাহর গ্রন্থাবলীতে বিশদভাবে উল্লেখিত রয়েছে। বর্তমান লেখক আরবীতে লিখিত 'আহ্কামুল কোরআন' গ্রন্থে এ আয়াত প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছে। জ্ঞানন্বেষী বিদ্বজ্জন তা দেখে নিতে পারেন।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ
السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ
النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۬ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٜ وَاَبُوْنَا
شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ
لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى
اسْتِحْيَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ
فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٝ نَجَوْتَ مِنَ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ
مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ
اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ
شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ
قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

(২১) অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর। (২২) যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। (২৩) যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দু' জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (২৪) অতঃপর মূসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। (২৫) অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৬) বালিকাদ্বয়ের একজন বলল পিতঃ, তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। (২৭) পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ চাহেন তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। (২৮) মূসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দু' টি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহ্র উপর ভরসা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ —শামদেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান। মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আঃ)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফেরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিসর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনযিল। মূসা (আঃ) ফেরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশংকাবোধ করে মিসর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলাবাহুল্য, এই আশংকাবোধ নবুওয়ত ও তাওয়াক্কুল কোনটিরই পরিপন্থী নয়। মাদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, মাদইয়ানেও ইবরাহীম (আঃ) –এর বংশধরদের বসতি ছিল। মূসা (আঃ)ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মূসা (আঃ) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিসর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ –অর্থাৎ, আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্ তাআলা এই দোয়া কবূল করলেন। তফসীরকারগণ বর্ণনা করেন, এই সফরে মূসা (আঃ)- এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এটা ছিল মূসা (আঃ)-এর সর্বপ্রথম পরীক্ষা। তাঁর পরীক্ষাসমূহের বিশদ বিবরণ সূরা তোয়াহায় একটি দীর্ঘ হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ – مَآءَ مَدْيَنَ বলে একটি কূপকে বোঝানো হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাত। وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ –অর্থাৎ, দু' জন রমণীকে দেখলেন, তারা তাদের ছাগপালকে পানির দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না যায়।

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٜ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ

– خَطْب শব্দের অর্থ শান, অবস্থা, উদ্দেশ্য এই যে, মূসা (আঃ) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? অন্যদের ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন? তারা জওয়াব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তারা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোন পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে একাজে আসতে হয়েছে? রমণীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি একাজ করতে পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি।

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল : (১) দুর্বলদেরকে সাহায্য করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। মূসা (আঃ) দু'জন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে পানি পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না। তখন তিনি তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। (২) বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশতঃ কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত

কোন অনর্থের আশংকা না হয়। (৩) আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্যে পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই কষ্ট স্বীকার করেছে। (৪) এধরনের কাজের জন্যে নারীদের বাইরে যাওয়া তখনও পছন্দনীয় ছিল না। একারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওযর বর্ণনা করেছে।

فَسَقٰى لَهُمَا -অর্থাৎ, মূসা, (আঃ) রমণীদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কূপ থেকে পানি তুলে তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস ছিল যে, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারী পাথর দ্বারা কূপের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে রমণীদ্বয় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারী পাথরটি দশ জনে মিলে স্থানান্তরিত করত। কিন্তু মূসা (আঃ) একাকী পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কূপ থেকে পানি উত্তোলন করেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই রমণীদ্বয়ের একজন মূসা (আঃ) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে শক্তিশালী।—(কুরতুবী)

ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

—মূসা (আঃ) সাত দিন থেকে কোনকিছু আহার করেননি। তখন এক বৃক্ষের ছায়ায় এসে আল্লাহ্ তাআলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোয়া করার একটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি। خَيْرٍ শব্দটি কোন কোন সময় ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যেমন اِنْ تَرَكَ خَيْرَا الْوَصِيَّةُ আয়াতে। কোন কোন সময় শক্তির অর্থেও আসে ; যেমন اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ —আয়াতে। আবার কোন সময় এর অর্থ হয় আহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই উদ্দেশ্য।—(কুরতুবী)

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ -কোরআনী রীতি অনুযায়ী এখানে কাহিনী সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরূপ : রমণীদ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাড়ী পৌঁছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কন্যাদ্বয় ঘটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে ; তাকে এর প্রতিদান দেয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্যে প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌঁছল। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলী অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনাদ্বিধায় কথাবার্তা বলত না। প্রয়োজনবশতঃ সেখানে পৌঁছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোন কোন তফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আস্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে কথা বলেছে। তফসীরে আরও বলা হয়েছে যে, মূসা (আঃ) তার সাথে পথ চলার সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও। বলাবাহুল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবতঃ এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই বালিকাদ্বয়ের পিতা কে ছিলেন, এ সম্পর্কে তফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত শোয়ায়ব (আঃ)। যেমন এক আয়াতে আছে, وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا।—(কুরতুবী)

اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ —বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি ; বরং তার পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ, কোন বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লজ্জা-শরমের পরিপন্থী ছিল।

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ -অর্থাৎ, শোয়ায়ব (আঃ)-এর এক কন্যা তার পিতার নিকট আরয করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ, চাকরের মধ্যে দু'টি গুণ থাকা আবশ্যক। (এক) কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং (দুই) বিশ্বস্ততা। আমরা পাথর তুলে পানি পান করানো দ্বারা তার শক্তি-সামর্থ্য এবং পথিমধ্যে আমাকে পশ্চাতে রেখে পথচলা দ্বারা তার বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ অর্থাৎ বালিকাদ্বয়ের পিতা হযরত শোয়ায়ব (আঃ) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসার (আঃ) বিবাহে দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা। বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। উদাহরণতঃ হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উসমান গনী (রাঃ)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন।-(কুরতবী)

মাসআলা : اُنْكِحَكَ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপার পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফেকাহ্‌বিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহকার্য সম্পন্ন করবে ; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোন কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্য-বাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়নি।

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ
الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّىْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْۤ اٰتِيْكُمْ
مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾
فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ
الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّىْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾
وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۗ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَاۤنٌّ وَّلّٰى
مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۗ يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ اِنَّكَ مِنَ
الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣١﴾ اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاۤءَ مِنْ
غَيْرِ سُوْۤءٍ ۙ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ
مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾
قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾
وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً
يُّصَدِّقُنِىْۤ ۖ اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ
عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ
اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَاۤ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾

(২৯) অতঃপর মূসা (আঃ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৩০) যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল, হে মূসা। আমি আল্লাহ্, বিশ্ব পালনকর্তা। (৩১) আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। হে মূসা, সামনে এস এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। (৩২) তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দু' টি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৩৩) মূসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। কাজেই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (৩৪) আমার ভাই হারুন, সে আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব, তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই দ্বারা এবং তোমাদের প্রাধান্য দান করব। ফলে, তারা তোমার কাছে পৌছতে পারবে না। আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ –অর্থাৎ, মূসা (আঃ) চাকুরীর নির্দিষ্ট আট বছর বাধ্যতামূলক এবং দুই বছর ঐচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, মূসা (আঃ) আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছরের? সহীহ্ বোখারীতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাসকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ, দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। পয়গম্বরগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ও প্রাপককে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশী দিতেন এবং তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকুরী, পারিশ্রমিক ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করবে।

نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ .... اِنِّىْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

–এই বিষয়বস্তু সূরা তোয়াহা ও সূরা নমলে বর্ণিত হয়েছে। সূরা তোয়াহায় اِنِّىْۤ اَنَا رَبُّكَ সূরা নমলে نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ এবং আলোচ্য সূরায় اِنِّىْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ বলা হয়েছে। বিভিন্ন সূরায় উল্লেখিত এসব আয়াতের ভাষা বিভিন্নরূপ হলেও অর্থ প্রায় একই। প্রত্যেক জায়গায় উপযুক্ত ভাষায় ঘটনা বিধৃত হয়েছে। অগ্নির আকারে এই তাজাল্লী ছিল —রূপক তাজাল্লী। কারণ, সত্তাগত তাজাল্লী এই দুনিয়াতে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সত্তাগত তাজাল্লীর দিক দিয়ে স্বয়ং মূসা (আঃ)-কে لَنْ تَرٰىنِىْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না।—মানে, আমার সত্তাকে দেখতে পারবে না।

সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায় ঃ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ –তূর পর্বতের এই স্থানকে কোরআন পাক 'বরকতময় ভূমি' বলেছে। বলাবাহুল্য, এর বরকতময় হওয়ার কারণ আল্লাহ্‌র তাজাল্লী, যা আগুনের আকারে এ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, যে স্থানে কোন গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে স্থানও বরকতময় হয়ে যায়।

ওয়াযে বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা কাম্য ঃ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا –এ থেকে জানা গেল যে, ওয়ায ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়।

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ
مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ
مُوسَىٰ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ
لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ
يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى
يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ
إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَٱسْتَكْبَرَ
هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا
لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ
فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً
يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾
وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم
مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ
مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

(৩৬) অতঃপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে পৌঁছল, তখন তারা বলল, এতো অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি। (৩৭) মূসা বলল, আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন যে তার নিকট থেকে হেদায়েতের কথা নিয়ে আগমন করেছে এবং যে প্রাপ্ত হবে পরকালের গৃহ। নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না। (৩৮) ফেরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার উপাস্যকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমার তো ধারণা এই যে, সে একজন মিথ্যাবাদী। (৩৯) ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ, জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে। (৪১) আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। কেয়ামতের দিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (৪২) আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে দুর্দশাগ্রস্ত। (৪৩) আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর মূসাকে কিতাব দিয়েছি মানুষের জন্যে জ্ঞানবর্তিকা, হেদায়েত ও রহমত, যাতে তারা স্মরণ রাখে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ —ফেরাউন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিল। তাই সে উযীর হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল। কারণ, কাঁচা ইট দ্বারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফেরাউনের এই ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম ফেরাউন এটা আবিষ্কার করেছে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রী যোগাড় করল। মজুর এবং কাঠ ও লোহার কাজ যারা করত, তাদের সংখ্যা ছিল এর অতিরিক্ত। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে আঁদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। ফলে ফেরাউনের হাজারো সিপাহী–এর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে। —(কুরতুবী)

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ –অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ফেরাউনের পারিষদবর্গকে দেশ ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। এখানে অধিকাংশ তফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহবান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ, জাহান্নাম বলে কুফরী কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মাওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রঃ)–এর সুচিন্তিত অভিমত (ইবনে আরাবীর অনুকরণে) এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সৎকর্মসমূহ পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নেয়ামতে পর্যবসিত হবে এবং কুফর ও জুলুমের কার্যসমূহ সর্প, বিচ্ছু এবং নানারকম আযাবের আকৃতি ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও জুলুমের দিকে আহবান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহবান করে ; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও জুলুম জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোন রূপকতা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকতার আশ্রয় নেয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে ; উদাহরণতঃ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا আয়াতে এবং فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ আয়াতে

وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ – مقبوح শব্দের বহুবচন। مقبوحين অর্থাৎ, বিকৃত। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে।

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ

بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ —'পূর্ববর্তী সম্প্রদায়' বলে নূহ, হূদ, সালেহ্ ও লূত (আঃ) এর সম্প্রদায় সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা মূসা (আঃ)–এর পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। بَصَآئِرَ শব্দটি بصيرة —এর

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا
كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَٰكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا
وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ
مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ
مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ
إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا
جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا
أُوتِيَ مُوسَىٰ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ
قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾
قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا
يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ
هُدًى مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

(৪৪) মূসাকে যখন আমি নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। (৪৫) কিন্তু আমি অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলেন না যে, তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। কিন্তু আমিই ছিলাম রসূল প্রেরণকারী। (৪৬) আমি যখন মূসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম, তখন আপনি তূর পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন না। কিন্তু এটা আপনার পালনকর্তার রহমতস্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেনি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। (৪৭) আর এ জন্য যে, তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। (৪৮) অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করল, তখন তারা বলল, মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, এই রসূলকে সেরূপ দেয়া হল না কেন? পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, উভয়ই জাদু, পরস্পরে একাত্ম। তারা আরও বলেছিল, আমরা উভয়কে মানি না। (৪৯) বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে এখন আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিতাব আন, যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (৫০) অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বোঝানো হয়েছে। যা আল্লাহ্ তাআলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। بَصَائِرَ لِلنَّاسِ এখানে ناس শব্দ দ্বারা মূসা (আঃ)-এর উম্মত বোঝানো হলে তাতে কোন খটকা নেই। কারণ, সেই উম্মতের জন্য তওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি ناس শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর আমলে যে তওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে? এ ছাড়া এ থেকে জরুরী হয় যে, মুসলমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত যে, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশে তওরাতের উপদেশাবলী পাঠ করার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে মূসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোন গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ করা। তওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্যে ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, সেই যুগের আহলে-কিতাবের হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ; যাতে কোরআন-অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কোরআনের পূর্ণ হেফাযতের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন কোন সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কোরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোন রহিত খোদায়ী গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থী ছিল। এ থেকে জরুরী নয় যে, সর্বাবস্থায় তওরাত ও ইনজীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সে সব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবিগণও তাদের একাজ অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তওরাত ও ইনজীলে যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলাবাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তাঁরাই উপকৃত হতে পারেন, যাঁরা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারেন। তাঁরা হলেন বিশেষজ্ঞ আলেম শ্রেণী। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তাই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে কোন ক্ষতি নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ -এখানে কওম বলে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাঈলের পর থেকে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে— وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ অর্থাৎ, এমন কোন উম্মত নেই, যার মধ্যে আল্লাহ্র কোন পয়গম্বর আসেননি। কিন্তু

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾ اَلَّذِيْنَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ
قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾
اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَاِذَا سَمِعُوا
اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ
اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ اَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ
مِنْ اَرْضِنَا اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ
كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾
وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ
لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥٨﴾ وَ
مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا
عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

(৫১) আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌঁছিয়েছি। যাতে তারা অনুধাবন করে। (৫২) কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর পূর্বেও আজ্ঞাবহ ছিলাম। (৫৪) তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (৫৫) তারা যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্যে আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। (৫৬) আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ্ তাআলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। (৫৭) তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্যে একটি নিরাপদ 'হরম' প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সর্বপ্রকার ফল-মূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযিকস্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৫৮) আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিল। এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ী। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি। (৫৯) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রসুল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে।

নবী-রসূলের আগমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই উম্মতও নয়।

توصيل শব্দটি وَصَّلْنَا - وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ থেকে উদ্ভূত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরো সূতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কোরআন-পাকে একের পর এক হেদায়েত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বার বার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবান্বিত হয়।

তবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি ঃ এ থেকে জানা গেল যে, সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌঁছাতে থাকা পয়গম্বরগণের তবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মাসক্তিতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে থাকতেন। কারও মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেয়ার সাধ্য তো কোন সহৃদয় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোষহীন। আজকালও যারা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ -এই আয়াতে সেসব আহ্‌লে কিতাবের কথা বলা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও কোরআন অবতরণের পূর্বেও তওরাত ও ইনজীল প্রদত্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন তিনি প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলম্ব না করে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পারিষদবর্গের মধ্য থেকে চল্লিশ জনের একটি প্রীতনিধিদল যখন মদীনায় উপস্থিত হয় তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খায়বর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তারাও জেহাদে অংশ গ্রহণ করল। কেউ কেউ আহতও হল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিহত হল না। তারা যখন সাহাবায়ে কেরামের আর্থিক দুর্দশা দেখল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অনুরোধ জানাল যে, আমরা আল্লাহ্‌র রহমতে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে কেরামের জন্যে অর্থসম্পদ সরবরাহ করব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ থেকে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। —(মাযহারী) হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত জাফর (রাঃ) মদীনায় হিজরতের পূর্বে যখন আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামী শিক্ষা পেশ করেন, তখনই আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেন। তারা ছিল খ্রীষ্টান এবং তওরাত ও ইনজীলে উল্লেখিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত। —(মাযহারী)

'মুসলিম' শব্দটি উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি, না সব উম্মতের জন্যে ব্যাপক? اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ -অর্থাৎ, আহ্‌লে কিতাবের এই আলেমগণ বলল, আমরা তো কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ (অনুগত, আজ্ঞাবহ) নিলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে

কোরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই ইসলাম' ও মুসলিমীন' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীকে 'মুসলিম' বলা হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ কেবলমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি নয় ; বরং সব পয়গম্বরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইসলাম ও মুসলিম শব্দ এই উম্মতের জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি স্বয়ং কোরআনেই আছে যে, هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ -আল্লামা সুয়ূতী এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবক্তা। এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং এই উম্মতের জন্যে বিশেষ উপাধি— এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং মুসলিম উপাধি শুধু এই উম্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণতঃ সিদ্দীক, ফারূক ইত্যাদি উপাধির কথা বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবুবকর ও ওমরের উপাধি, কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারূক হতে পারেন।

أُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ -অর্থাৎ, আহ্লে কিতাবের মুমিনদেরকে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। কোরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্রা বিবিগণের সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে- وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ -সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্যে দুইবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) যে কিতাবধারী পূর্বে তার পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (২) যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন প্রভুরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্ ও রসূলেরও ফরমাবরদারী করে। (৩) যার মালিকানায় কোন বাঁদী ছিল। এই বাঁদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্যে জায়েয ছিল। কিন্তু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে দুইবার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আমল যেহেতু দুটি, তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, সে পূর্বে এক পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনুগত্য ও মহব্বত রসূল হিসেবেও করেন এবং স্বামী হিসেবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য এবং প্রভুর আনুগত্য। বাঁদীকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় আমল বিবাহ্ করা। কিন্তু এই জওয়াবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরস্কার ইনসাফভিত্তিক হওয়ার কারণে সবার জন্যে ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মুমিন অথবা পবিত্রাগণের কোন বৈশিষ্ট্য নেই ; বরং যে কেউ দুই আমল করবে, সে দুই পুরস্কার পাবে। এই প্রশ্নের জওয়াব সম্পর্কে আমি আহকামুল কোরআন সূরা কাসাসে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। কোরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এই যে, এখানে উদ্দেশ্য শুধু দুই পুরস্কার নয়। কেননা, এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্যে সাধারণ কোরআনি বিধি لَآ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ -অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কোন আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন না। বরং সে যতই সৎকর্ম করবে, তারই হিসেবে পুরস্কার পাবে। তবে উল্লেখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কারের অর্থ এই যে, তাদেরকে প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। প্রত্যেক নামাযের দ্বিগুণ, রোযা, সদকা, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ সওয়াব তারা লাভ করবে। কোরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরস্কারের জন্যে সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল اجرين কিন্তু কোরআন এর পরিবর্তে বলেছে, أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ- এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর উদ্দেশ্য তাদের প্রত্যেক আমল দুইবার লিখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্যে দুই সওয়াব দেয়া হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতা আছে, তিনি বিশেষ কোন আমলকে অন্যান্য আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারও এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ তাআলা রোযার সওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? যাকাত ও সদকার সওয়াব এত বাড়ালেন না কেন? এটা সম্ভবপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চাইতে কোন না কোন দিক দিয়ে বেশী। তাই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোন কোন আলেম যে দ্বিগুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্যে بِمَا صَبَرُوْا এর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ, শ্রমে সবর করা দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ।

وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ -অর্থাৎ, তারা মন্দকে ভাল দ্বারা দূর করে। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তফসীরকারকদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, ভাল বলে এবাদত এবং মন্দ বলে গোনাহ্ বোঝানো হয়েছে। কেননা, পুণ্য কাজ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে বলেন, اتبع السيئة الحسنة تمحها —অর্থাৎ, গোনাহের পর নেক কাজ কর। নেককাজ গোনাহকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ বলেন, ভাল বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনবধানতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অপরের অজ্ঞতার জওয়াব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এগুলো সবই ভাল ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আছে ঃ প্রথম, কারও দ্বারা কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে ; যেমন উপরে মুয়াযের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়, কেউ কারও প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরীয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেয়া জায়েয আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে মন্দের প্রত্যুত্তরে ভাল এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। ইহকালে ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পথনির্দেশটি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থাৎ, মন্দ ও যুলুমকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর। (যুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর)। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ –অর্থাৎ,তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোন অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শোনে, তখন তার জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে একথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাস্‌সাস বলেন, সালাম দুই প্রকার। (এক) মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। (দুই) সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম। অর্থাৎ, প্রতিপক্ষকে বলে দেয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নেব না। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

'হেদায়েত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) শুধু পথ দেখানো। এর জন্যে জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেই যাবে। (দুই) পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে পোঁছে দেয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বরং সব পয়গম্বর যে হাদী অর্থাৎ, পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং হেদায়েত যে তাঁদের ক্ষমতাধীন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, এই হেদায়েতই ছিল, তাঁদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা তাঁদের ক্ষমতাধীন না হলে তাঁরা নবুওয়ত ও রেসালতের কর্তব্য পালন করবে কিরূপে? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্(সাঃ)হেদায়েতের উপরে ক্ষমতাশালী নন। এতে দ্বিতীয় অর্থের হেদায়েত বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেবেন এবং তাকে মুমিন বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতাধীন। হেদায়েতের অর্থ ও তার প্রকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সূরা বাকারার শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমে আছে এই আয়াত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পিতৃব্য আবু তালেব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনরূপেই ইসলাম গ্রহণ করুক। এর প্রেক্ষাপটে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে বলা হচ্ছে যে, কাউকে মুমিন–মুসলমান করে দেয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে আছে, আবু তালেবের ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, বিতর্ক ও তাকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ, এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর মনোকষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে।

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا –অর্থাৎ, হারেস ইবনে ওসমান প্রমুখ মক্কার কাফের তাদের ঈমান কবুল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি, কিন্তু আমাদের আশংকা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেয়া হবে। —(নাসায়ী) কোরআন পাক তাদের এই খোঁড়া অজুহাতের তিনটি জওয়াব দিয়েছেঃ

(১) أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ

অর্থাৎ, তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের হেফাযতের জন্যে একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পুর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মক্কার ভূখণ্ডকে নিরাপদ হারাম করে দিয়েছেন। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ কুফর, শিরক ও পারস্পরিক শত্রুতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, মক্কার হরমের অভ্যন্তরে হত্যা ও যুদ্ধবিগ্রহ ঘোরতম হারাম। হরমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পেলে পুত্র চরম প্রতিশোধস্পৃহা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারত না। অতএব যে প্রভু নিজ কৃপায় কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তাদেরকে এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন, ঈমান কবুল করলে তিনি তাদেরকে ধ্বংস হতে দেবেন, এ আশংকা চরম মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ইয়াহ্ইয়া ইবনে–সালাম বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হরমের কারণে নিরাপদ ছিলে, আমার দেয়া রিযিক স্বচ্ছন্দে খেয়ে যাচ্ছিলে এবং আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যের এবাদত করছিলে। এই অবস্থার কারণে তো তোমাদের ভয় হল না উল্টা ভয় হল আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে।—(কুরতুবী) আলোচ্য আয়াতে হরমের দুইটি গুণ বর্ণিত হয়েছেঃ (১) এটা শান্তির আবাসস্থল, (২) এখানে বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে সর্ব প্রকার ফল–মূল আমদানী হয়, যাতে মক্কার বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে।

মক্কার হরমে প্রত্যেক প্রকার ফল–মূল আমদানী হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন ঃ মক্কা মোকাররমা, যাকে আল্লাহ্ তাআলা নিজ গৃহের জন্যে সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোন বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কেননা, গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফল–মূল তরকারি ইত্যাদির তো কোন কথাই নেই। কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক–বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হজ্বের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরও বার থেকে পনের লাখ মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা গড়ে দুই–আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোন দিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে। বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবা–রাত্রির সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণ তৈরী খাদ্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় ثَمَرَاتٌ শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থান ছিল এরূপ বলারঃ **ثمرات كل شجر** এর পরিবর্তে ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ বলার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, ثَمَرَاتٌ শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফল–মূল নয়; বরং এর অর্থ যে কোন উৎপাদন। মিল কারখানায় নির্মিত সামগ্রীও মিল–কারখানার ثَمَرَاتٌ তথা উৎপাদন। এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে মক্কার হরমে শুধু আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদিই আমদানী হবে না; বরং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সবকিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোন দেশেই বোধহয় তদ্রূপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের অজুহাতের জওয়াব যে, যিনি তোমাদের কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এদেশে কোন কিছুই উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্য–সামগ্রী এখানে এনে সমাবেশ করেছেন, সেই

বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নেয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে— এরূপ আশংকা করা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়।

(২) এরপর তাদের অজুহাতের দ্বিতীয় জওয়াব এই ঃ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কুফর ও শেরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত-বাটি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শেরকই হচ্ছে প্রকৃত আশঙ্কার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শেরকের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ কর না, ঈমানের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ কর।

(৩) তৃতীয় জওয়াব এই ঃ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

এতে বলা হয়েছে, যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে ঈমান কবুল করার ফলে তোমাদের কোন ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত যেমন ক্ষণস্থায়ী, কারও কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী-দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা, যা চিরস্থায়ী, অক্ষয়। চিরস্থায়ী ধন ও নেয়ামতের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কষ্ট সহ্য করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا –অর্থাৎ, অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহ্র আযাব দ্বারা–বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজ্জাযের উক্তি অনুযায়ী এই 'সামান্য'র অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোন বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সামান্য'-র অর্থ সামান্যক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্যক্ষণ থাকে; যেমন কোন পথিক অল্পক্ষণের জন্যে কোথাও বসে বিশ্রাম নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا – ام শব্দটি মূল ও ভিত্তির অর্থেও বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। امها এর সর্বনাম দ্বারা قرى বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান নগরীতে কোন রসূলের মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌঁছে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌঁছার পর যখন লোকেরা তা কবুল করে না, তখন জনপদসমূহের উপর আযাব নেমে আসে।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলার পয়গম্বরগণ সাধারণতঃ বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা, এরূপ শহর ও গ্রাম সাধারণতঃ শহরের অধীন হয়ে থাকে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও প্রধান শহরে কোন বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামে আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে; এ কারণেই কোন বড় শহরে রসূল প্রেরিত হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌঁছে যেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহ্র পয়গাম কবুল করা ফরয হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর আযাব নেমে আসাই ছিল স্বাভাবিক।

নির্দেশ ও আইন-কানুনে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন ঃ এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোন নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শোনার ওযর গ্রহণযোগ্য হয় না।

এ জন্যে রমযান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহেরও তা মেনে নেয়া জরুরী। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্যে এটা তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারী না করা পর্যন্ত জরুরী হবে না।—(ফতোয়া গিয়াসিয়া)

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا
عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا
حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ
شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَا
إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ
كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا
يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن
يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا
كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ
مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ
الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

(৬০) তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বোঝ না? (৬১) যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর তাকে কেয়ামতের দিন অপরাধীরূপে হাযির করা হবে? (৬২) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবী করতে, তারা কোথায়? (৬৩) যাদের জন্যে শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা। এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায়মুক্ত হচ্ছি। তারা কেবল আমাদেরই এবাদত করত না। (৬৪) বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের আহবান কর। তখন তারা ডাকবে। অতঃপর তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব দেখবে। হায়! তারা যদি সৎপথ প্রাপ্ত হত! (৬৫) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? (৬৬) অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আশা করা যায়, সে সফলকাম হবে। (৬৮) আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্বে। (৬৯) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। (৭০) তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ – অর্থাৎ, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন সবই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নস্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না।

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশী করে ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরীয়তসম্মত প্রাপক হবে—যারা আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা, বুদ্ধির দাবী এটাই এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারাই। এই মাসআলা হানাফী মযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে মুখতারেও উল্লেখিত আছে।

হাশরের ময়দানে কাফের ও মুশরেকদেরকে প্রথম প্রশ্ন শেরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ, যেসব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরীক বলতে এবং তাদের কথামত চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে কি? জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি ; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে একথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই, কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্যে আমরাও অপরাধী, কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ, আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গম্বরগণ ও তাঁদের নায়েবগণ তাদেরকে হেদায়েতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়গম্বরগণের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোন ধর্তব্য ওযর নয়।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ – এই আয়াতের এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, وَيَخْتَارُ -এর অর্থ বিধান জারীর ক্ষমতা। আল্লাহ্ তাআলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোন শরীক নেই, তখন বিধান জারীতেও তিনি একক। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধান জারী করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই, তেমনি বিধান জারী করার ক্ষমতায়ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে কাইয়্যেম যাদুল মা'আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, وَيَخْتَارُ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা মানবজাতির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্যে মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জওয়াব لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ -অর্থাৎ এই কোরআন আরবের দু'টি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের

মধ্য থেকে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করা হল না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হত। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাযিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যে মালিক সমগ্র সৃষ্টজগতকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যাতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোন বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্যে মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়?

এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ঃ হাফেয ইবনে কাইয়্যেম এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান উদ্ভাবন করেছেন। তা এই যে, দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয়; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে উর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অথচ সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি জান্নাতুল ফেরদাউসকে অন্য সব জান্নাতের উপর, জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল প্রমুখ বিশেষ ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরশতাদের উপর, পয়গম্বরগণকে সমগ্র আদমসন্তানের উপর, তাঁদের মধ্যে দৃঢ়চেতা পয়গম্বরকে অন্য পয়গম্বগণের উপর, ইবরাহীম খলীল ও হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণের উপর, ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরকে সমগ্র মানবজাতির উপর, কোরাইশকে তাদের সবার উপর, মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সব বনী হাশেমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ্ তাআলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি।

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করাও আল্লাহ্ তাআলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ইচ্ছাই। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব স্থানও সৎকর্ম অথবা সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও পুণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দু'টি। একটি ইচ্ছাদীন, যা সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবু বকর, অতঃপর ওমর ইবনে খাত্তাব অতঃপর ওসমান গনী অতঃপর আলী মুর্তযা (রাঃ)-এর ক্রমকে উপরোক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (রহঃ)-এরও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা, এই বিষয়বস্তুর উপর ফার্সী ভাষায় লিখিত আছে। বর্তমান লেখক এর "বো'দিত তাফসীল লি মাস আলাতিত তাফযীল" নামে উর্দু তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আমি 'আহকামুল কোরআন' সূরা কাসাসেও আরবী ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুধীবর্গ অনুসন্ধিৎসু হলে সেখানে দেখে নিতে পারেন।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ
ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ
ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا
تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ
يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾
وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ
فَعَلِمُوٓا۟ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾
إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ
مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُو۟لِى ٱلْقُوَّةِ
إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾
وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ
مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ
ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

(৭১) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? (৭২) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? (৭৩) তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭৪) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (৭৫) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহ্র এবং তারা যা গড়ত, তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে। (৭৬) কারূন ছিল মূসারসম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টামি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না, আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে ভালবাসেন না। (৭৭) আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেননা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم
بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ
ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রাতের সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ অর্থাৎ, রাতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে بِضِيَآءٍ বলে তার কোন উপকারিতা উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলোক যে উত্তম তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারের শেষে أَفَلَا تَسْمَعُونَ এবং রাতের ব্যাপারের শেষে أَفَلَا تُبْصِرُونَ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, দিনের শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও উপকারিতা এত বেশী যে, তা দৃষ্টিসীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। তাই أَفَلَا تَسْمَعُونَ বলা হয়েছে। কেননা, মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চোখে দেখা বিষয় সব সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতার তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই أَفَلَا تُبْصِرُونَ বলা হয়েছে।—(মাযহারী)

সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের সাথে মূসা (আঃ)-এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত কারূনের সাথে তাঁর দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এর মহব্বতে ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়ঃ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا কারূনের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধন-সম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভুলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ্ তাআলার সাথে কৃতঘ্নতা করে এবং ধন-সম্পদে ফকীর-মিসকীনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধনভাণ্ডারসহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেয়া হয়।

قَٰرُونَ —সম্ভবতঃ হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কোরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূসা (আঃ)-এর সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে-আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে মূসা (আঃ)-এর চাচাত ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরও উক্তি আছে।—(কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী)

রূহুল-মা'আনীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কারূন তওরাতের হাফেয ছিল এবং তওরাত তার অন্য সবার চাইতে বেশী মুখস্থ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হল। তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও

জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ। মূসা (আঃ) ছিলেন সমগ্র বনী ইসরাঈলের নেতা এবং তাঁর ভ্রাতা হারুন (আঃ) ছিলেন তাঁর উযীর ও নবুওয়তের অংশীদার। এতে কারূনের মনে হিংসা জাগে যে, আমিও তাঁর জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সেমতে সে মূসা (আঃ)-এর কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোন হাত নেই। কিন্তু কারূন এতে সন্তুষ্ট হল না এবং মূসা (আঃ)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে।

فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ - بغى কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ জুলুম করা। আয়াতের অর্থ এই যে, সে ধন-সম্পদের নেশায় অপরের প্রতি জুলুম করতে লাগল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালাম ও সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, কারূন ছিল বিত্তশালী। ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায় সে বনী-ইসরাঈলের উপর নির্যাতন চালায়।—(কুরতুবী)

এর অপর অর্থ অহংকার করা। অনেক তফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কারূন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী-ইসরাঈলের মোকাবেলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ - كنوز শব্দটি كنز এর বহুবচন। এর অর্থ ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার। শরীয়তের পরিভাষায় كنز এমন ধন-ভাণ্ডারকে বলা হয়, যার যাকাত দেয়া হয়নি। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারূন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডারপ্রাপ্ত হয়েছিল।—(রূহুল মা'আনী)

لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ - تنوء শব্দের অর্থ বোঝার ভারে ঝুঁকিয়ে দেয়া। عصبة শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য এই যে, তার ধন-ভাণ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর চাবি এত অধিকসংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। বলাবাহুল্য, চাবি সাধারণতঃ হালকা ওজনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্তু প্রচুরসংখ্যক হওয়ার কারণে কারূনের চাবির ওজন এত বেশী ছিল, যা একদল লোকও সহজে বহন করতে পারত না। (রূহ)

لَا تَفْرَحْ - فرح -এর শাব্দিক অর্থ আনন্দ, উল্লাস। কোরআন পাক অনেক আয়াতে এই فرح কে নিন্দনীয়রূপে ব্যক্ত করেছে, যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ —অন্য এক আয়াতে আছে وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ আরও এক আয়াতে আছে وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا কিন্তু কোন কোন আয়াতে এর অনুমতি বরং এক ধরনের আদেশও বর্ণিত আছে; যেমন وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ আয়াতে এবং فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا আয়াতে। এসব আয়াতের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই আনন্দ ও উল্লাস নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ, যা দম্ভ ও অহংকারের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটা তখনই হতে পারে, যখন এই আনন্দকে নিজস্ব ব্যক্তিগত গুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয়—আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়া মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না, তা নিষিদ্ধ নয়; বরং একদিক দিয়ে কাম্য। কারণ, এতে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

—অর্থাৎ, ঈমানদারগণ কারূনকে এই উপদেশ দিল, আল্লাহ্ তোমাকে যে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালীন শান্তির ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়াতে তোমার যে অংশ আছে তা ভুলে যেয়ো না।

দুনিয়ার অংশ কি? এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এর অর্থ মানুষের বয়স এবং এই বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা পরকালে কাজে আসতে পারে। সদকা-খয়রাতসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাসসহ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এ অর্থই বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী) এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন অর্থাৎ, টাকা-পয়সা, বয়স, শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি-এগুলোকে পরকালের কাজে লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই যতটুকু পরকালের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ তো ওয়ারিসদের প্রাপ্য। কোন কোন তফসীরকার বলেন, দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন, তদ্দ্বারা পরকালের ব্যবস্থা কর, কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভুলে যেয়ো না যে, সবকিছু দান করে নিজে কাঙ্গাল হয়ে যাবে। বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্যে রাখ। এই তফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন ধারণের উপকরণ বোঝানো হয়েছে।

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ
أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ
جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا
مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا
كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ
وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ
لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا
يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾
مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

(৭৮) সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। (৭৯) অতঃপর কারূন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা পার্থিবজীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়, কারূন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান (৮০) আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মী, তাদের জন্যে আল্লাহ্র দেয়া সওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী। (৮১) অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না। (৮২) গতকল্য যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যুষে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ্ তাঁর বন্দাদের মধ্যে যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন ও হ্রাস করেন। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না। (৮৩) এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম। (৮৪) যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা সে মন্দ কর্ম পরিমাণেই প্রতিফল পাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي —কারও কারও মতে এখানে 'এলম' বলে তওরাতের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, কারূন তওরাতের হাফেয ও আলেম ছিল। মূসা (আঃ) যে সত্তর জনকে তূর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মনোনীত করেছিলেন, কারূন তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার উপরোক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে এলম বলে অর্থনৈতিক কলাকৌশল বোঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের কোন দখল নেই এটা অমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ কারূন একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য—এগুলোও তো আল্লাহ্ তাআলারই দান ছিল;—তার নিজস্ব গুণ গরিমা ছিল না।

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ —কারূনের উপরোক্ত উক্তির আসল জওয়াব তো তাই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ, যদি স্বীকার করে নেয়া যায় যে, তোমার ধন-সম্পদ তোমার বিশেষ কর্মতৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা, এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ্ তাআলার দান। এই জওয়াব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই কোরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ-সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। অর্থের প্রাচুর্য কোন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসেবে কোরআন পাক অতীত যুগের বড় বড় ধনকুবেরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ .... —এই আয়াতে الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ —অর্থাৎ, আলেমদের মোকাবেলায় الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালের চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا —এ আয়াতে পরকালের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। علو শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। فساد বলে, অপরের উপর জুলুম বোঝানো হয়েছে।—(সুফিয়ান

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ
قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ
إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ
وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ
مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الم ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا
يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَن كَانَ
يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾

(৮৫) যিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। বলুন আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে হেদায়েত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্যে বিভ্রান্তিতে আছে। (৮৬) আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার পালনকর্তার রহমত। অতএব আপনি কাফেরদের সাহায্যকারী হবেন না। (৮৭) কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহ্র আয়াত থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৮৮) আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধান তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

সূরা আল-আনকাবূত
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৬৯

পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে শুরু করিতেছি।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। (৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ। (৫) যে আল্লাহ্র সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহ্র সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

সওরী)

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, গোনাহ্ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। কারণ, গোনাহের কুফলস্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যারা অহংকার, যুলুম অথবা গোনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অংশ নেই।

জ্ঞাতব্য : যে অহংকারে নিজেকে অপরের চাইতে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভাল পোষাক পরা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুন্দর বাসগৃহের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়; যেমন সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

গোনাহের দৃঢ় সংকল্পও গোনাহ : আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোন গোনাহের বদ্ধপরিকরতার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গোনাহ্। (রূহুল মা'আনী) তবে পরে যদি আল্লাহ্র ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গোনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় সওয়াব লিখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গোনাহ্ করতে সক্ষম না হয়; কিন্তু চেষ্টা ষোলআনাই করে, তবে গোনাহ্ না করলেও তার আলমনামায় গোনাহ্ লিখাহবে।—(গাযযালী)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ -এর সারমর্ম এই যে, পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের জন্যে দু'টি বিষয় জরুরী। এক ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা এবং (দুই) তাকওয়া তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা। এই দুটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যেসব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে, সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শর্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ -সূরার উপসংহারে এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে এবং রেসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-এর বিস্তারিত কাহিনী তথা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা, তার ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাঁকে ফেরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সূরার শেষভাগে শেষ নবী রসূল (সাঃ)-এর এমনি ধরনের অবস্থার সার-সংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার কাফেররা তাঁকে বিব্রত করেছে, তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা থেকে কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ -অর্থাৎ, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন তথা তিলাওয়াত, প্রচার ও মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি পুনরায় আপনাকে 'মা'আদে' ফিরিয়ে নেবেন। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মাআদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্যে আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি

বিশেষতঃ হরম ও বায়তুল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করতে হয়েছে, কিন্তু যিনি কোরআন নাযিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ, শত্রুপক্ষ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিল। যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহ্‌ফা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হল এবং বায়তুল্লাহ্ ও স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই জিবরাঈল (আঃ) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌঁছে দেয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে-আব্বাসের এক রেওয়েতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহ্‌ফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিদায় মক্কীও নয়, মদনীওনয়।—কুরতুবী

কোরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় ঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন, তিনি আপনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন তেলাওয়াত ও কোরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ —এখানে وَجْهَهُ বলে আল্লাহ্ তাআলার সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোন কোন তফসীরকার বলেন, وَجْهَهُ বলে এমন আমল বোঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহ্‌র জন্য খাঁটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে— এছাড়া সব ধ্বংসশীল।

সূরা আল-কাসাস সমাপ্ত

সূরা আল আনকাবূত

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ – يُفْتَنُونَ শব্দটি فِتْنَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। ঈমানদার বিশেষতঃ পয়গম্বরগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাঁদেরই হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা কোন সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন অধিকাংশ পয়গম্বর, শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেয়া হয়েছে।

রেওয়ায়েতদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূল সেসব সাহাবী, যাঁরা মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলেম, সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন।— (কুরতুবী)

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا — অর্থাৎ, এসব পরীক্ষা বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা, খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ, অসৎ এবং খাঁটি-অখাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তাআলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা রয়েছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) থেকে এর আরও একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞানলাভ করে, কোরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়। অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ্ তাআলার জানা আছে।

وَمَنْ جٰهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ
الْعٰلَمِيْنَ ۝٦ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ
عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٧
وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جٰهَدٰكَ
لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَىَّ
مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ ۝٩ وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ
فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ
لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ
الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْمُنٰفِقِيْنَ ۝١١ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا
سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ
مِّنْ شَىْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝١٢ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ
اَثْقَالِهِمْ ؗ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝١٣

(৬) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। (৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব। (৮) আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করব। (১০) কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি ; কিন্তু আল্লাহ্র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্র আযাবের মত মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।' বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন? (১১) আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা মুনাফেক। (১২) কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। অথচ তারা পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী (১৩) তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। অবশ্য তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ —'হিতাকাঙ্ক্ষা' ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোন কাজ করতে বলাকে وصيت বলা হয়।— (মাযহারী)

بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا — حسن শব্দটি ধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে حسن বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَاِنْ جٰهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ — অর্থাৎ, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শেরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে, لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق অর্থাৎ,আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিগণের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবু সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও।— (মুসলিম ও তিরমিযী) এই আয়াত হযরত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সা'দের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহ্র ফরমানের মোকাবেলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন ঃ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত, এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অনশন ভঙ্গ করল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমন একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফেররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতুক পরকালে শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে, আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রুকূতে উল্লেখ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ
إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾
وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا
عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن
قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾
يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

(১৪) আমি নূহ (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী। (১৫) অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা করলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করলাম বিশ্ববাসীর জন্যে। (১৬) স্মরণ কর ইবরাহীমকে। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন; তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বোঝ। (১৭) তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের এবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁর এবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৮) তোমরা যদি মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যাবাদী বলেছে। স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছে দেয়াই তো রসূলের দায়িত্ব। (১৯) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন? এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ। (২০) বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করেন। তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

করা হয়েছে। বলা হয়েছে, أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ এতে উল্লেখিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাফের সংগীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কেয়ামতের দিন তোমার আযাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থ-কড়ি দেয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বুদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এর জওয়াবে বলেছেন, যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ অর্থাৎ, কেয়ামতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। সূরা নজমে আরও বলা হয়েছে যে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া হবে না। কেননা, একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়-নীতির পরিপন্থী।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে— একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদের বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সে-ও পাপী; আসল পাপীর যে শাস্তি হবে, তার প্রাপ্যও তাই : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবু হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের সওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং সৎকর্মীদের সওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপ কাজে লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাফেরদের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব-উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোন সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও কাফেরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রেসালতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আঃ)-এর কাহিনী

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۖ وَمَا
لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ
وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ
اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ۗ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ
وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ
مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ
اِلٰى رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ
وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ
الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

(২২) তোমরা স্থলে ও অন্তরীক্ষে আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন হিতাকাঙ্খী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (২৩) যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (২৪) তখন ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এছাড়া কোন জওয়াব ছিল না যে, তারা বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৫) ইবরাহীম বললেন, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার জন্যে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এরপর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লা'নত করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৬) অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন লূত। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৭) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব, তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাঁকে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয় পরকালেও সে সংলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২৮) আর প্রেরণ করেছি লূতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।

উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গম্বর, যিনি কুফর ও শেরকের মোকাবেলা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোন পয়গম্বর ততটুকু হননি। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কোরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয়শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তাঁর আরও বয়স আছে।

মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফেরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোন সময় সাহস না হারানো— এগুলো সব নূহ (আঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় কাহিনী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ্ করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত লূত (আঃ) ও তাঁর উম্মতের ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা এগুলো সব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্যে এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্যে বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ — হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভাগ্নেয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে ইবরাহীম (আঃ)-এর মু'জেযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং তাঁর পত্নী সারা, যিনি চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গী হন। কূফার একটি জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ অর্থাৎ, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশ-ত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার এবাদতে কোন বাধা নেই।

হযরত নখয়ী ও কাতাদাহ বলেন, اِنِّيْ مُهَاجِرٌ হযরত ইবরাহীমের উক্তি। কেননা, এর পরবর্তী বাক্য وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ - তে নিশ্চিতরূপে তাঁরই অবস্থা। কোন কোন তফসীরকার اِنِّيْ مُهَاجِرٌ - কে হযরত লূত (আঃ)-এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। হযরত লূত (আঃ)-ও এই হিজরতে শরীক ছিলেন, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লূত (আঃ)-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত : হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রথম পয়গম্বর, যাঁকে দ্বীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন।— (কুরতুবী)

কোন কোন কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায় :

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۙ وَتَأْتُونَ
فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا
ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ
انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا
إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ
الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا
لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ
إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ
رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا
لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا
امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ
هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾
وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِلَىٰ
مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ
ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

(২৯) তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ? জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল একথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩০) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালেম। (৩২) সে বলল, এই জনপদে তো লূতও রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তাঁর স্ত্রী ব্যতীত; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৩) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে সে বিষণ্ন হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৪) আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাজিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। (৩৫) আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি। (৩৬) আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোআয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا অর্থাৎ, আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদী, খ্রীষ্টান, প্রতিমাপূজারী সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদিগকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে, কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে, কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎকর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ – এখানে লূত (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম, পুংমৈথুন, দ্বিতীয়,রাহাজানি এবং তৃতীয়, মজলিসে সবার সামনে অপকর্ম করা। কোরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন গোনাহ্ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ্। কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব গোনাহ্ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণতঃ পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেয়া। উম্মে-হানী (রাঃ)-এর এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্য মজলিসের সবার সামনে করত।— (নাউযুবিল্লাহ্)

আয়াতে উল্লেখিত প্রথম গোনাহ্‌টিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে, ব্যভিচারের চাইতেও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ – مستبصر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চক্ষুষ্মানতা এর অর্থ চক্ষুষ্মানত। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শেরক করে করে আযাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকী বস্তুজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা বোঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শাস্তির কোন্ দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালেম ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করে এবং মযলুম ও বিপদগ্রস্ত কোনঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কেয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো।

সূরা রোমেও এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হবে। আয়াত ঃ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ অর্থাৎ, তারা জাগতিক কাজ কর্ম খুব বোঝে; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন।

কোন কোন তফসীরবিদ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং সে তাঁকে সত্য মনে করত; কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ — মাকড়সাকে عنكبوت বলা হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোন কোন মাকড়সা মাটিতে

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جٰثِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسٰكِنِهِمْ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ وَلَقَدْ
جَآءَهُم مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا
سٰبِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا
بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ
إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَيْءٍ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا
يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

(৩৭) কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৩৮) আমি আ'দ ও সামূদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুশিয়ার। (৩৯) আমি কারূন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিন্তু তারা জিতে যায়নি। (৪০) আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি যুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। (৪১) যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত। (৪২) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪৩) এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্যে দেই; কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে। (৪৪) আল্লাহ্ যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে।

বাসস্থান তৈরী করে। বাহ্যতঃ এখানে তা বোঝানো হয়নি। এখানে সে মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরী করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলাবাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর। এই তার সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোন প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে।

মাসআলা ঃ মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিষ্কার করা সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না। কেননা, এই ক্ষুদ্র জন্তুটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে। খতীব হযরত আলী (রাঃ) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা'লাবী ও ইবনে আতিয়্যা হযরত আলী থেকেই বর্ণনা করেন যে, طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فان تركه يورث الفقر — অর্থাৎ মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিষ্কার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের আঙিনা পরিষ্কার রাখ। — (রূহুল-মা'আনী)

وَتِلْكَ الْأَمْثٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُونَ

মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপহাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তা-ভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে ফোটে না।

আল্লাহ্র কাছে আলেম কে? ঃ ইমাম বগভী হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, সেই আলেম, যে আল্লাহ্র কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাঁর এবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বোঝে নিলে কেউ আল্লাহ্র কাছে আলেম হয় না, যে পর্যন্ত কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কোরআন অনুযায়ী আমল না করে।

মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ্ ও রসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝে।

হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَتِلْكَ الْأَمْثٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُونَ -

(ইবনে- কাসীর)